



জারুল চৌধুরীর মানিকজোড়

১. আমার বাবা

বাসায় ঢেকার আগেই বুজতে পারলাম আজকে আমার কপালে দৃশ্য আছে। ছেটখটি দৃশ্য নয়, বড়সড়ে ডাল সাইজের দৃশ্য। বাইরে দড়িতে একটা লুঙ্গি ঝুঁকছে, তার মানে বাবা এসেছেন। শিউলী গাছের একটা ডাল আজকে আমার পিঠে ভাঙ্গ হবে। বাসার এত কাছে শিউলী গাছ থাকার কোন অবহি হয় না। সাবা বছরে মাস্থানেক তিন-চারটা ঘূল দিয়েই তার কাজ শেষ, লাভের ঘাকে লাভ বাবা যখন খুশি তখন পেটানোর জন্যে সেখান থেকে একটা ডাল ভেঙে আনতে পারেন।

আমি ভয়ে ভয়ে ভিতরে চুকলাম। মনে খুব একটা দুর্বল আশা, দড়িতে যে লুঙ্গিটা ঝুঁকছে সেটা বাবার না, অন্য কারো। গ্রামের বাড়ি থেকে কেউ বেড়াতে এসেছে, কারো বিয়ে কিংবা অসুখ, জমি নিয়ে মাঝলা করতে এসেছে বা সে রকম একটা কিছু। ভিতরে চুক্তেই আমার আশা ফাটা বেলুনের যত চুপসে গেল। শুনতে পেলাম বাথকর্মে বাবা ঘড়ঘড় শব্দ করে জিব পরিষ্কার করছেন। জিব পরিষ্কার করার এই ব্যাপারটা আমি বাবা ছাড়া আর কাউকে কখনো করতে দেখিনি। প্রথমে একটা চিকন বাশের টাছ দিয়ে জিবটা চেছে ফেলেন। তারপরে শোল ঘাছ ধরার যত নিজের জিবটা ধরার চেষ্টা করতে থাকেন, সেটা বারবার পিছলে ঘায়, তবু তিনি হাল ছাড়েন না। একবার ধরার পর সেটা নানাভাবে কচলাতে থাকেন, ঘনতে থাকেন, রংগড়াতে থাকেন, তখন একই সাথে তার গলা থেকে এক বকম ঘড়ঘড় শব্দ বের হতে থাকে। শুনলে মনে হবে কেউ খুঁঝি তাকে জবাই করে ফেলার চেষ্টা করছে। পুরো ব্যাপারটাই একটা খুব খারাপ দশ্য, সেখার যত কিছু নয়। মাসে এক-দুইবার যখন বাবা আসেন তখন আমাদের প্রত্যেক বেলা সেই দশ্যটা দেখতে হয়, শুনতে হয়। বাবা ঢাকায় একটা ওবুধের কোম্পানিতে কাজ করেন। যত ঢাকা বেতন পান এবং ঘূৰ খেয়ে চুৰি-চামারী করে আরো যত পয়সা পান সব দিয়ে আমাদের স্বাইকে নিয়ে খুব সহজেই ঢাকায় একটা বাসা ভাড়া করে থাকতে

পারতেন। কিন্তু বাবা সেটা করেন না। আমাদেরকে মুক্তির শব্দের মাঝের সাথে রেখে তিনি ঢাকায় অন্য একটা মেসে একা একা থাকেন। ছুটিচাটায় বাবা বাসায় আসেন, বাসায় এসে দুই কেলা জিব পরিষ্কার করেন আর আমাদের দুই ভাইকে পেটেন। আগে ভাবতাম, নিশ্চয়ই সত্তি সত্তি আমরা কোন সোব করি যাব জন্যে এই শাস্তি। এখন বুঝতে পেরেছি, আমরা আসলে কিছু করিনি, বাবার পেটাতে ভাল লাগে, খুব একটা আনন্দ পান পিটিয়ে। ঠিক শুরু করার আগে আমি বাবাকে সুড়ৎ করে মুখে লোল টেনে নিতে দেখেছি। কিছু কিছু ঘানুর নিশ্চয়ই আছে যারা এরকম হয়, যদের পেটাতে ভাল লাগে। আমার বাবা সেরকম একজন ঘানুর। নিয়মিত পিচুন্ডী খেলে ঘানুমের অভ্যাস হয়ে বাবার কথা, কিন্তু আমাদের এখনও অভ্যাস হয়নি। পিচুন্ডী একটু বাড়াবাঢ়ি, ছেটিখাটি চড় চাপড় বা কানমলা নয়, প্রচণ্ড ঘার, কখনো কখনো চামড়া ফেটে রাঙ্গ বের হয়ে যায়। আমি তবু কোন মতে সহজ করতে পারি কিন্তু লাবলুর একেবারে বাগটা বেজে যায়। কেমন করে পিচুন্ডী খেলে বাথা কম লাগে আমি লাবলুকে অনেকবার তার ট্রেনিং দিয়েছি, কিন্তু গাধটা এখনো কিছু শিখেনি।

বাবা বাথরুম থেকে বের হওয়ার আগেই আমি শুট করে বাগাদের দুকে যাবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু বাবা তবু দেখে ফেললেন। আমাকে দেখেই দাত মুখ খিচিয়ে একটা গর্জন করে বললেন, শুওরের বাচ্চার এখন বাসায় আসার সময় হয়েছে? হারামজালা, আজকে যদি আমি পিটিয়ে তোর পিটের চামড়া না তুলি —

বাবা আমাকে শুওরের বাচ্চা না হয় হারামজালা ছাড়া আর কিছু জাকেন না। আমার যে একটা নাম আছে, একসময়ে নিশ্চয়ই বাবাই সেটা দিয়েছিলেন, সেটা মনে হয় তাঁর মনেই নেই। বাবার চেহারা, কথা বলার ধরন, চালচলন সব বিছুতে একটা পশু পশু ভাব রয়েছে। কোন পশু সেটা ঠিক ধরতে পারি না, যাকে মনে হয় শেয়াল, যাকে মাকে মনে হয় বেঢ়ী না হয় নেউল। মুখটা একটু লম্বা, বড় বড় দাত, পান খেয়ে দাঁতে হলুদ রং, দাতগুলির মাঝে বড় বড় ফাঁক, ধূতনিতে এক গোজা দাঢ়ি, পশু মনে হওয়া বিচ্ছিন্ন কিছু নয়।

বাবা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাত গুটালেন, মনে হল এখনই আমাকে এক রাউণ্ড পিটিয়ে নেবেন, কিন্তু কি মনে করে পিটালেন না। মনে হয় আগরেরের নামাজের সময় হয়ে গেছে, এখন জুত করে পেটানোর সময় নেই। গামছা দিয়ে দাঢ়ি মুছতে মুছতে দাত কিড়িমিড়ি করে আমাকে গালি দিয়ে তাড়াতাড়ি নামাজ পড়তে চলে গেলেন। একটু পরেই পাশের ঘর থেকে আমি বাবার একামণ্ড শুনতে পেলাম।

আমি বাগাদের পিয়ে দরজার আড়ালে লাবলুকে খুঁজে পেলাম। ফৌসফৌস করে কাঁচাছে। মা খুব হৈ চৈ করে ঘামতে ঘামতে রাজা করছেন। কড়াহিয়ের মাঝে গরম তেলে কি একটা ছেড়ে দিলেন, ছ্যাং ছ্যাং শব্দ হতে লাগল। রাগাদের তেল মশলার গন্ধ, চুলো থেকে ধোয়া উঠছে। আমি তার মাঝে লাবলুকে জিজ্ঞেস করলাম, বাবা কখন এসেছে?

লাবলু ফৌসফৌস করে কাঁচাতে কাঁচাতে বলল, দুপুরে।

কাঁচাছিস কেন?

লাবলু কিছু বলল না। জিজ্ঞেস করলাম, যেরেছে তোকে?

না। এখনো যারে নাই।

তাহলে কাঁচাছিস কেন?

এখনি তো যারবে।

আমি কি কি কলা বুঝতে পারলাম না। লাবলুটার মত গাধা আর একটাও নেই। আজকালকার দুনিয়ার একক্ষণ্য বোকা ঘানুর কেমন করে জন্ম নেয় কে জানে! আমি গলা নামিয়ে বললাম, শার্টের তলায় একটা হাফ সোয়েটার পরে নে। আর মনে রাখিস, মখন ঘারবে তখন গলা ফাটিয়ে চিংকার করবি। ভাল করবি মরে যাচ্ছিস।

কেন?

তাহলে বাথা কম লাগে।

লাবলু অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। আমার বয়স বার, লাবলুর আটি, আমার থেকে চার বছরের মত ছেটি। কিন্তু তার বুদ্ধিগুঁড়ি মনে হয় একেবারে তিনি বছরের বাচ্চা। আমার দিকে তাকিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, সত্তি?

হ্যা। আমি মাথা নেড়ে বললাম, আর খুব জোরে বসি চিংকার করিস তাহলে কেউ একজন এসে তো ছাটিয়েও নিতে পারে।

কে ছুটাবে?

আমি কিছু কলাম না। সত্ত্বিই তো, কে ছুটাবে? মাঝের সেই সাহস নেই, ইচ্ছাও নেই। আশেপাশের বাসায় যারা আছে তারা শুধু শব্দ দেখে। আমি কেনে আঙুল দিয়ে কান চুলকাতে চুলকাতে দাঢ়িয়ে রইলাম। এই বাসা থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া মনে হয় আর কোন গতি নেই। লাবলুটার কি অবস্থা হবে সেটাই চিন্তা। যাকে মাঝে বাবা মাঝেরা তাদের ছেলেমেয়েদের ত্যাজ্যপূর্ত করে দেয়, ত্যাজ্যবাবা করে দেওয়ার কি কোন নিয়ম নেই?

আত্মে বাবার পর বাবা আমাকে আর লাবলুকে পিটালেন। সাধারণতও তাই করেন, খেয়ে মনে হয় আগে একটু জোর করে নেন। তারপর আমাদের বলেন বই নিয়ে আসতে। আমরা বই নিয়ে এসে বসি, তারপর আমাদের ইংরেজি বানান জিজ্ঞেস করতে শুরু করেন। একটার পর আরেকটা, যতক্ষণ না আটকে যাই। আমাকে প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন, “লেফটেনেন্ট”, সেটা জানতাম। ঠিক ঠিক বলামাত্র বাবার শুরু রাগে কালো হয়ে গেল। তখন জিজ্ঞেস করলেন “নিমোনিয়া”, সেটাও ঠিক ঠিক বলে ফেললাম। তখন বাবা আরও রেগে গেলেন, দাত কিড়িমিড়ি করে জিজ্ঞেস করলেন “ইউক্যালিপ্টাস”, আমি আটকে গেলাম। সাথে সাথে বাবার চোখগুলো ছলে উঠল একশ ওয়াটের বাতির মত। মুখে লোল টেনে বললেন, শয়তানের বাচ্চা, বলমাইশের ধাঢ়ী, পড়াশোনা নেই, নামাজ রোজা নেই, দিনবাত শুধু ঘোরাঘুরি, আজকে যদি আমি

তোর জান শেষ না করি।

শিউলী গাছের ডালটা আগেই ভেড়ে এনেছিলেন, সেটা অধূর উপর দিয়ে গেল। আমি গুরুর মত চিংকার করতে করতে একটা ভৌত জ্বানোর চেষ্টা করতে লাগলাম। কোন লাভ হল না। অশেপাখে যারা থাকে তারা জ্ঞানালুক মজা দেখতে লাগল। লাবলুটাকে এত ট্রেনিং দেয়ার পরও কোন লাভ হল না। মাথা নিচু করে ফোসফোস করে কাঁদতে কাঁদতে মার খেয়ে গেল। চিংকার করে না বলে বাবা ঠিক বুঝতে পারেন না মারটা ঠিকমত লাগছে কি না, বাবা মনে হয় তাই গাধটাকে আরো জোরে জোরে মারেন।

আমাদের পেটানোর পর বাবার এক রকমের আরাধ্য হয়। খনিকক্ষণ তখন হাসি হাসি মুখ করে মায়ের সাথে সাংসারিক কথাবার্তা বলেন। তারপর বাজারের ব্যাগটা নিয়ে বের হয়ে যান। আজকেও বের হয়ে গেলেন। কোথায় যান কাউকে বলে যান না, কিন্তু আমরা সবাই জানি। বাবার বাজারের ব্যাগ বোঝাই করা থাকে ওষুধ। যেখানে কাজ করেন সেখান থেকে চুরি করে আনেন। বাবা এই ওষুধগুলি বিজ্ঞি করতে যান। মীলা ফামেসীর মতি দিয়ার সাথে ঠিক করে রাখা আছে, বাবা ওষুধগুলি তাদের কাছে কম দামে বিজ্ঞি করে আসেন।

বাবা ফিরে আসার আগেই আমি আর লাবলু শুয়ে পড়ি। শুয়ে শুয়ে শুনি বাবা ঘরে ঢুকছেন। ঘুমানোর আগে বাবা চা খান। চা খেয়ে ওঝু করেন, আবার অনেকক্ষণ সময় নিয়ে বিকট শব্দ করতে করতে ভিব পরিষ্কার করেন। তারপর এশার নামাজ পড়েন। আমি আর লাবলু শুয়ে শুয়ে শুনি বাবা সূর করে করে সূর্যা পড়ছেন। বাবা কখনো নামাজ খাজা করেন না। মনে হয় অনেক রকম চুরিচামারি করেন, সেই সব পাপ কটানোর জন্যে তাকে অনেক নামাজ পড়তে হয়।

লাবলু বিছানায় শুয়ে ফোসফোস করে কাঁদে। আমি তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিই। চাপা গলায় আদর করে, কিছু একটা বলে মনটা ভাল করার চেষ্টা করি। কিন্তু কোন লাভ হয় না। এই গাধটা কাঁদতেই থাকে। যদি কোনদিন বাসা থেকে পালাই মনে হয় লাবলুটাকে নিয়েই পলাতে হবে। কি যত্নপা!

২. সলীল

আমাদের খুন্স তিনি রকমের ছেলে রয়েছে। এক রকমের ছেলে হচ্ছে ভাল ছেলে। তারা মন দিয়ে পড়াশোনা করে, তাদের চুল নির্ধৃতভাবে আচড়নো থাকে। তাদের জ্ঞান কাপড় হয় ধৰ্মবে পরিষ্কার, তারা কখনও হ্রেষ ওঝার্ক আনতে ভুলে না, তাদের হ্রেষ ওঝার্ক কখনো কোন ভুল থাকে না। তারা কখনো খারাপ কথা বলে না, মারপিট করে না, রাস্তা থেকে আচার কিনে খায় না। তাদের বাবারা সাধারণতঃ সাবজ়েশন, না হয়

ম্যাজিস্ট্রেট, না হয় ভেলের। তাদের সাথে মারপিট করলে তাদের বাবারা হেডম্যাস্টারের কাছে দারোয়ান দিয়ে কড়া চিঠি লিখে পাঠান। তারা সবাই বড় লোকের ছেলে, সেজন্য তাদের চেহারা ছবিও ভাল।

আরেক ধরনের ছেলে আছে, তারা সবকিছুতেই মাঝারি। তারা পড়াশোনাতে সেরকম ভাল না, তাদের কাপড় চোপড়ও সাদাসিধে, কথাবার্তাও খুব সাধারণ। তারা স্কুলে বেশি কথাবার্তা বলে না, খগড়াখাটি করে না, তাদের ধাকা দিলে মুখ কাঁচামাচ করে সরে যায়। তাদের বাবারা সাধারণত গরিব যানুষ, স্কুলের যাস্টার, অফিসের কেরানী না হয় দোকানদার। নিরীহ বলে যে একটা কথা আছে সেটা মনে হয় তৈরিই করা হয়েছে এই ছেলেদের অন্যে।

আমাদের খুন্স তিনি নম্বরের ছেলেরা হচ্ছে ডানপিটে ধরনের ছেলে। তারা শাট্টের হ্যাতা উল্লেখ করে খাঁজ করে রাখে, তাদের চুল ঝাউ গাছের মত উঁচু হয়ে থাকে। তারা সাধারণত পড়াশোনা করে না, অবসর সময়ে তারা সিনেমার নায়িকাদের নিয়ে গল্প করে। খুন্স বখন স্যার থাকেন না তারা তখন নিরীহ ছেলেগুলিকে জ্বলাতন করে।

আমি প্রথমে চেষ্টা করেছিলাম এক নম্বর ছেলেদের দলে যেতে, সেটা সত্ত্ব হল না। দেখলাম, আস্তে আস্তে দুই নম্বর দলে চলে যাচ্ছি। তাই কয়দিন থেকে চেষ্টা করছি তিনি নম্বর দলে যেতে। ব্যাপারটা যত সোজা ভেবেছিলাম আসলে তত সোজা না। তিনি নম্বর দলে থাকলে যাকে মাঝে কঠাল গাছের নিচে বসে সিগারেট টানতে হয় আমি জানতাম না।

আমাদের খুন্স শুধু একটা ছেলে আছে যে একই সাথে তিনি দলেই থাকতে পারে। সেটা হচ্ছে সলীল। এমনিতে পড়াশোনা করে না, গত বছর হঠাতে দুম করে পরিষ্কার ধার্ত হয়ে গেল। অংকে ৯৮, ইংরেজিতে ৮৪। আমরা একেবারে আকাশ থেকে পড়ালাম, কিন্তু সলীল দেবি মোটেও অবাক হল না, বরং তার ভাবন্ত্বিং দেখে যানে হল সেটাই খুব স্বাভাবিক। কিন্তু পরিষ্কার ধার্ত হয়েও সে এক নম্বর দলে গোল না। এক নম্বর দলে যেতে হলে বড়লোকের ছেলে হতে হয়, পরিষ্কার কাপড় পরতে না। এক নম্বর দলে যেতে হলে বড়লোকের ছেলে হতে হয়, পরিষ্কার কাপড় পরতে না। সলীলের বাবা তালের ডাকিলের মূহূরী। তার বাবা বড়লোক না হলেও সলীলের চেহারা খুব ভাল। গতবার স্কুলে যখন নাটক হল স্যারেরা তাকে রাজপুত্রের পাট দিয়েছিলেন শুধু চেহারা সেখে। সে আবার নিরীহ দলের না। যেদিন কাসেম সলীলের শাড়ে ধাকা দিয়ে চলল, এই যালাউনের বাচ্চা, সলীল কোন কথা না বলে কাসেমের কলার থেকে তাকে দরজার সাথে ঠেসে থেকে বলল, রাজাকারের ছাঁও, আরেকব্যার এই কথা বলবি তো এক শুধৃতে দীত খুলে দেব।

কাসেম তিনি নম্বর দলের, আমাদের ফুটবল চিমের হাত ব্যাক। তার গায়ে হাত দিতে সাহস দরকার, শক্তিরও দরকার। সলীলের সাহস আছে সেটা নিয়ে কারো কোন সন্দেহ নেই। শক্তি আছে কিনা সেটা কোনদিন ভাল করে প্রমাণ হয়নি। মনে হয় সেটা

পরীক্ষা করে দেখার মত সাহস করো নেই।

সলীলের সাথে আবার বেশ বক্তৃত আছে। আমার যেরকম গল্প বই পড়ার শব্দ সলীলেরও তাই। ছেঁচিদের পড়া নিমখে উপন্যাসগুলি সলীল জানি কিভাবে কিভাবে জোগাড় করে আনে। নিজে বাত জেগে পড়ে, পড়া শেষ হলে আমাকে পড়তে দেয়, অনিঝাদে ঘিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ি। বাবা এমনিতেই যা মারতে পারেন, এরকম একটা উপন্যাস পড়তে দেখলে বে আমার কি অবস্থা করবেন চিন্তা করলেই কাল ঘায় ছুটে যাব।

মোটাসোটা জয়জ্ঞমাট একটা উপন্যাস পেলেই সলীল আমার জন্যে আলাদা করে রাখে। আজকেও অংক ট্যাসের ফাঁকে খবরের কাগজে খোঢ়া একটা বই আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, এক নম্বর জিনিস।

বহুচার নাম 'নীল নয়নার অভিসার'। আমি বইটা উল্টোপালেট দেখে একটা নিষ্পাস ফেলে ফেরৎ দিয়ে বললাম, এখন না।

সলীল অবাক হয়ে বলল, কেন?

বাবা এসেছে। এক সপ্তাহ থাকবে।

সত্ত্বা?

ইয়া। আমি শাটের কলার সরিয়ে দেখালাম। শিডলী গাছের ডাল দিয়ে মেরে বাবা কেমন করে গলার কাছে রক্ত জমিয়ে ফেলেছেন।

সলীল ভুক্ত বুচকে মাথা নাড়ল, কিছু বলল না। এই জন্যে সলীলকে আমার ভাল লাগে, তার ভিতরে মনে হয় একটু মাঝাদ্যা আছে। অন্য যে কেউ হলো দীক্ষা বের করে হেসে বলত, এই, দেখ, দেখ, মূলীরকে তার বাবা কেমন বানিয়েছে! সবাই তখন ছুটে আসত দেখার জন্যে যেন কত বড় মজা হয়েছে।

চিফিনের ছুটিতে সলীল শাটের কলার সরিয়ে গলাটা আরেকবার দেখে বলল, এইভাবে মারল? কি করেছিলি?

কিছু না।

কিছু না?

ন।।

ভগবানের কীরা?

ভগবানের কীরা। খোদার কসম।

সলীল অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, তোর বাবার নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল আছে।

কি গোলমাল?

স্যাডিশিক।

সেটা কি জিনিস?

বাবা অন্য ঘানুরকে অত্যাচার করে আনল পায়। আমি বইয়ে পড়েছি। এটা হচ্ছে

স্যাডিশিক ব্যবহার।

ব্যাপারটা অসন্তুষ্ট কিছু না। সলীল আবার থেকে অনেক বেশি বই পড়ে, এই সব ব্যাপার কোন বইয়ে পড়ে ফেলবে, বিচিত্র কি। বাবার মেরে আনন্দ পাওয়ার ব্যাপারটির একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে জানার পরও অবিশ্বাস আমার খুব একটা স্বত্ত্ব হল না। আমি একটা নিষ্পাস ফেলে বললাম, মনে হয় কেনালিন বাসা থেকে পালিয়ে যেতে হবে।

সলীল হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে চোখ বড় বড় করে বলল, সত্ত্বা?

সত্ত্বা।

আমারও মাঝে যাকে এত ইচ্ছা করে পালিয়ে যেতে।

কেন? তুই কেন পালিয়ে যাবি? তোর বাবা কি পেটায়?

না, সেরকম কিছু না। কিন্তু অন্য রকম অশাস্ত্র আছে।

কি অশাস্ত্র?

এই কত রকম অশাস্ত্র — সলীল হাত নেড়ে পুরো ব্যাপারটা উভিয়ে দেবার ভান করল। নিশ্চয়ই আমাকে বলতে চাই না, আমি তাই আর জোর করলাম না।

সলীল খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল, সত্ত্বা পালাবি?

আমি একটু অবাক হয়ে সলীলের দিকে তাকালাম। তার চোখ দুটি কেমন জানি চকচক করছে। দেখে আমার কোন সন্দেহ হল না যে সলীল সত্ত্বা সত্ত্বা কোথাও পালাতে চায়। জিঞ্জেস করলাম, কোথায় পালাবি?

কত জায়গা আছে। গয়না নৌকা করে ভাটি এলাকায় যেতে পারি। কি সুন্দর! দেখলে তোর মাথা খারাপ হয়ে যাবে। একেবারে কাঁচের মত ভাল, নিচে দেখবি পাহাড়। মাইলের পর মাইল —

তুই কেমন করে জানিস?

বাবার কাছে শুনেছি। বাবা ভাটি এলাকা থেকে এসেছে। যদি সেখানে না যেতে চাস তাহলে সমুদ্রে যেতে পারি। ট্র্যালের করে যাহেশখালি, না হয় কৃতুবদিয়া, না হয় সেট মাল্টি, নীল জল, দূর পাহাড়ে! আহ! সলীল জিব দিয়ে এরকম শব্দ করল, মনে হল যেন পুরো দশ্যাটা চেখে যাচ্ছে।

সমুদ্রে যদি যেতে না চাস — সলীলের চোখ হঠাৎ আবার চকচক করতে থাকে, তাহলে আমরা বেদে নৌকা করে যেতে পারি। বেদের নৌকা দেখিসনি? সাপের ঝাপি নিয়ে আসে? তাদের সাথে ঘুরে বেড়াবি। সাপের খেলা দেখাবি! সাপের মত্ত বিক্রি করবি।

বেদের নৌকা? আমি অবাক হয়ে বললাম, তোকে নেবে কেন?

কেন নেবে না?

তুই কি বেদে?

বেদে হচ্ছে যাব।

আমি হি হি করে হাসলাম, ধূর গাধা ! ইচ্ছ করেলহি কি বেদে হওয়া যায় ?

সলীল কেমন জানি আনন্দনা হয়ে তাকিয়ে থাকে। তাকে দেখে হঠাৎ মনে হয় বেদে হয়ে জন্ম হয়লি বলে তার জীবনে বুঝি খুব বড় একটা ক্ষতি হয়ে গেছে।

৩. সাহেব বাড়ি

রশীদ স্যার আমাদের ইতিহাস পড়ান। আসল ইতিহাস মনে হয় খারাপ না, কিন্তু আমাদের ক্লাসে যে জিনিসটা পড়ানো হয় তার থেকে জন্ম আর কিছু হতে পারে না, রাজা বাদশাহ নিয়ে বানানো সব গালগাল্প। সলীল একবার কোথা থেকে একটা বই ভোগাড় করে এনে দিয়েছিল, বইয়ের নাম “প্রাচীন পৃথিবীর সভ্যতা”, সে যে কি সাংঘাতিক একটা বই ! পড়লে মনেই হয় না ইতিহাস পড়ছি, মনে হয় রহস্য উপন্যাস পড়ছি। বিশ্বের ফারাওদের কাহিনী, কেমন করে যদি তৈরি করত তার ইতিহাস, দক্ষিণ আমেরিকার মায়াদের কাহিনী, কেমন করে প্রত্যেকদিন হাজার হাজার মানুষের বুক কেটে দাপিশ বের করে সূর্য দেবতাকে উৎসর্প করত তার বর্ণনা, রোমানদের গল্প, গ্রিসদাসের বিজ্ঞানের কি সাংঘাতিক একটা কাহিনী ! কিন্তু আমাদের ক্লাসে সেসব কিছুই পাওনা হয় না। রশীদ স্যার মনে হয় ব্যাপারটা চের পেয়েছেন, তাই আমাদের কিছু পড়ানোর চেষ্টা করেন না। ক্লাসে এনে চেয়ারে দুই পা কুলে একটা বিচিত্র ভঙ্গিতে বসে পড়েন, দেখে মনে হয় এভাবে বসতে বুঝি খুব আবায়। তারপর ইতিহাস বইটা হাতে নিয়ে বলেন, বাহার পৃষ্ঠা থেকে খটি পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়ে মনে মনে। খেলমাল করবি না। খবরদার !

আমরা প্রথমে একটু সময় পড়ি, তারপর নিজেরা নিজেরা কিসিহিস করে কথা বলি, চুপি চুপি চের পুলিশ খেলি। যাদের কাছে ডিটেকটিভ বই আছে ইতিহাস বইয়ের উপর রেখে পড়তে শুরু করি। যদিদ স্যার মাথে মাথে ছফ্ফার দিয়ে বলেন, কোম কথা না, খবরদার।

আমরা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার কথা বলতে শুরু করি। কোন রকম কথা না বলে কেমন করে থাকে একজন মানুষ ? সলীল আমার পাশে বসেছিল, গলা নাখিয়ে বলল, এক জায়গায় যাবি আজ ?

কোথায় ?

সাহেব বাড়ি।

সেটা কোনখানে ?

মজিদ স্যার আবার হস্তার দিলেন, খবরদার, আর কোন কথা না। অবাই করে ফেলব।

সলীল তাই আর কথা বলতে পারল না। চোখ নাখিয়ে বুঝিয়ে দিল সাহেব বাড়ি

হচ্ছে রহস্যময় এক বাড়ি।

সলীলের এটা প্রায় নেশার মত হয়ে গেছে। রহস্যময় জিনিসের অন্যে সে কোথায় কোথায় ধূরে বেড়ায় ! রহস্যময় সব জিনিসে তার শখ। সত্যিকারের রহস্যময় জিনিস আর কয়টা আছে ? কিন্তু সলীলের জন্যে সেটা কেন সমস্যা না, সাধারণ একটা জিনিসকে সে সাংঘাতিক একটা রহস্যময় জিনিস হিসেবে কল্পনা করে নিতে পারে। সবার কাছে যেটা মনে হয় জল্লা জায়গার ভাঙা একটা বাড়ি সলীল সেটা দেখে খুঁত হয়ে যাব। তার চোখ চকচক করতে থাকে, উদ্বেজনায় কথা বলতে পারে না। বড় বড় নিচৰুস ফেলে বলে, ইশ ! কি সাংঘাতিক ! কি সাংঘাতিক !

সলীলের সাথে ধূরে ধূরে আমারও এখন একটু অভ্যাস হয়েছে। ব্যাপারটা আসলে কঠিন না। প্রথমে অনেক বই পড়তে হয়। বইয়ে নানা ব্রকম বিচিত্র কাহিনী থাকে, সেগুলি জানা থাকলে কল্পনা করা খুব সোজা। ভাঙা একটা বাড়ি দেখে সলীল বলে, দেখ, দেখ একেবারে আজটুকু মন্দিরের মত !

আমিও মাথা নেড়ে বলি, হ্যা, এই ওপরে নিশ্চয়ই পুরোহিত দাঢ়াত পাথরের চারু নিয়ে ?

হ্যা, আর এই বারান্দায় মানুষকে শোওয়াতো বলি দেয়ার জন্যে। মানুষ আর মানুষ দাঢ়িয়ে থাকত চারিদিকে। হাত তুলে গান গাইত —

আমি আর সলীল তখন বিচিত্র একটা শব্দ বের করতে শুরু করে দিই, যেন প্রাচীন মানুষ গান গাইছে। ব্যাপারটা খারাপ না।

সলীলের রহস্যময় বাড়িটাও সেরকম একটা কিছু হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে হয় সেখানে যাওয়াটা খারাপ না। আজ হাফ স্কুল, দুপুরে ছুটি হয়ে যাবে। সকার ট্রেনে বাবা ঢাকা ফেরত যাবে, তার আগে এমনিতেই বাসার ফিরে যাওয়ার তো কোন ঘানেই হয় না। খামোশ আরেক চেট মার খাওয়া।

স্কুল ছাটির পর আমি আর সলীল নদীর তীর ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। নদীর মনে হয় এক ধরনের স্বানু আছে। এর কাছে আসলেই মন ভাল হয়ে যাব। এর কারণটা কি কে জানে ? মনে হয় অনেক খোলামোলা, অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাব সে জনে। যখন বড় কোন নৌকা যাব তখন আমি আর সলীল দাঢ়িয়ে দাঢ়িয়ে দেখি, কি যে ভাল লাগে দেখতে ! যাকিমা দাঢ়ি টানছে, বড় লম্বি দিয়ে দুজন দুপুর থেকে টেলেছে, বুড়ো মাধ্যি শক্ত করে হাত ধরে রেখেছে। নৌকার যাবেই এক কোণার একজন রামা যাসিয়েছে, কি আশ্চর্য রহস্যময় ব্যাপার !

নদীর তীর ধরে হেঠে হেঠে কদম্বতলা পর্যন্ত এসে ত্রীজের ওপর দিয়ে হেঠে নদী পার হয়ে এলাম। নদীর এপাশে আরো অনেকদূর হেঠে লাশকটা ধর পার হয়ে চালমারী পাহাড়ের পিছন দিয়ে গিয়ে, দুটো সর্বে ক্ষেত্রের পর হেঠে খালটা পার হয়ে বেশ অংলা স্বানু একটা জায়গায় সলীল এসে থামল। অকারণে গলা নাখিয়ে বলল, এটা সাহেব মতন একটা জায়গায় সলীল এসে থামল। অকারণে গলা নাখিয়ে বলল, এটা সাহেব

বাড়ি।

বাড়ি কই?

এ যে দেবিস না?

আমি তাকিয়ে দেখলাম, সতীই গাছপালার ভিতরে একটা পুরানো দালান। দেখে
মনে হয় ক্ষেত্রে পড়ে আছে। চারিদিক থেকে গাছ দের হয়ে এসেছে লতাপাতায় ঢাকা।
দেখেই কেমন জানি না গা ছমছম করতে থাকে। সলীল ফিসফিস করে বলল, কি
সাংঘাতিক না?

আমি মাথা নাড়লাম।

আয়, আরেকটু কাছে যাই।

কাব বাড়ি এটা।

জানি না।

কেউ থাকে এখানে?

ধূর ! কেমন করে থাকবে ? দেবিস না এটা পোড়াবাড়ি। কি রকম ছমছমে
দেখেছিস ? কি সাংঘাতিক ! তাই না ?

আমি আবার মাথা নাড়লাম।

আয় ভিতরে যাই।

ভিতরে ? আমি চমকে উঠে বললাম, ভিতরে যাবি ?

কেন যাব না ? দেখে আসি।

আমার ঠিক ইচ্ছে হচ্ছিল না কিন্তু তবু সলীলের উৎসাহে এগিয়ে গেলাম। বাসার
পিছন দিকে একটা ভাঙা সিঁড়ি পাওয়া গেল, গাছপালা লতাপাতায় ঢাকা। সলীল বলল,
চল উপরে উঠি।

কাব না কাব বাসা !

কেউ থাকে না এখানে। আর আমরা তো চুরি করতে যাচ্ছি না, দেখতে যাচ্ছি।

আমি বাধ্য হয়ে সলীলের সাথে সাথে ওপরে উঠতে থাকি। ওপরে একটা বারান্দা
মত পাওয়া গেল। দেখান দিয়ে আরেকটা সিঁড়ি বেঁধে মনে হল ছান্দের দিকে যাওয়া
যায়। দুজনে রঙ্গন দিয়েছি, হঠাৎ করে কে যেন কানের কাছে বলল, কি খোকা, কাকে
চাও ?

আমি আর সলীল এমন চমকে উঠলাম সে আর বলার মত নয়। আরেকটু হলে
এত জোরে লাফিয়ে উঠতাম, নিশ্চয়ই একেবারে ছান্দে মাথা টুকে যেতো। অনেক কষ্টে
নিজেদের শান্ত করে ঘূরে তাকিয়ে দেশি, একজন অঙ্গুত মানুষ আমাদের দিকে তাকিয়ে
আছে। মানুষটা শুকনো মতন, চোখে সোনালী ফেনের চশমা, মাথায় কাঁচা পাকা চুল।
দেখে মনে হয়, কলেজের প্রফেসর কিন্তু গায়ের জামা কাপড় বাকা ছেলেদের মত !
রঞ্জিন একটা শার্ট, তার সবগুলি বেতাম খোলা। ভিতরে একেবারে অসম্ভব পরিস্কার
একটা পেঞ্জি, মেল এইমাত্র কিনে এনে পরেছে। নীল রঙের ভুনভূসে একটা প্যান্ট,

পায়ে টেনিস শু। হাতে ধূর চকচকে একটা ধড়ি, দেখে মনে হয় ধূর দানী। মানুষটাকে
একই সাথে ধূর শিক্ষিত একজন ভদ্রমানুষ আবার কেমন জানি পাগল পাগল মনে
হচ্ছে। সবচেয়ে বিচ্ছি হচ্ছে একটা লাল গামছা, যেটা তার গলা থেকে ঝুলছে।
রিকশাওয়ালা, কূলী বা চামীরা দেখাবে গামছা ঝুলিয়ে রাখে দেরকম।

আমাদের বাসিকস্থণ লাগল সামলে নিতে। সলীল সামলে নিল আগে, আমতা
আমতা করে বলল, না যানে হয়ে—

কাউকে খোজ করছ ? লোকটার গলার স্বর ধূর ভাল। টেলিভিশনে যারা খবর
পড়ে তাদের মত।

সলীল আবার মাথা নাড়ল, উহ। কাউকে খোজ করছি না।

আমি ভয়ে ভয়ে লোকটার দিকে তাকালাম। এখনই নিশ্চয়ই বাঁজখাই গলায়
একটা ধমক দেবে, সেই ধমকে আমরা নিশ্চয়ই দিশেছারা হয়ে ছুটে পালাব। কিন্তু
লোকটা ধমক দিল না। বরং মনে হল একটু হেসে দিল। হেসে বলল, তোমরা কারা ?
এখানে কি মনে করে ?

আমি বললাম, ইয়ে, যানে—

কোন কাজে, নাকি এমনি ?

এমনি !

বেশ বেশ। লোকটা চশমা খুলে তার লাল গামছা দিয়ে ধূর যত্ন করে তার চশমাটা
পরিস্কার করতে শুরু করল। তারপর আবার চোখে দিয়ে বলল, কাজের অনেক সময়
পাবে বড় হলে। এখন এমনিতেই ধূরোধূরি কর। সেটাই ভাল।

লোকটাকে বদমেজাজি মনে হচ্ছে না, হয়তো ধমক দিয়ে আমাদের বিদায় করে
দেবে না। আমি সাহস করে জিজেস করলাম, আপনি এখানে থাকেন ?

আমি ? সব সময় থাকি না। যাকে যাকে থাকি।

সলীলের চোখ চকচক করে উঠে, কি সুন্দর যানা !

সুন্দর ? লোকটি অবাক হয়ে সলীলের দিকে তাকাল।

ইয়া ! কি সুন্দর চারিনিকে। গাছপালা নির্ঘন সুমশাম !

নির্ঘন ? সুমশাম ?

ইয়া ! এটা কি আপনার নিজের বাসা ?

আমার পূর্বপুরুষের ছিল। এখন আমার। কিছুদিনের জন্যে আমার।

তারপরে ?

তারপরে জানি না কি হবে। লোকটা একটা নিঃশ্বাস ফেলল, তারপর লাল গামছা
দিয়ে মুখ মুছে বলল, এখন আমার চা খাওয়ার সময়। তোমরা কি খাবে এক কাপ চা
আমার সাথে ?

আমি সলীলের দিক তাকালাম। একেবারে অপরিচিত একজন মানুষের সাথে চা
খাওয়া কি ঠিক হবে ? বাবাকে দেখেই কিনা জানি না, বড় মানুষদের আমার কেন জানি

বিশ্বাস হয় না, শুধু মনে হয়, নিশ্চয়ই কেন রকম যদি যতলব আছে। এই লোকটাকে দেখে অবিশ্বিত কেহন জানি ভাল মানুষের মত মনে হচ্ছে। আমরা তাই আর না করতে পারলাম না। লোকটির পিছনে হেটে হেটে পাখের একটা ঘরে চুকলাম। বাইরে থেকে দেখে বেরকম মনে হয় বাসাটি ভেঙে পড়ে যাচ্ছে, ভিতরে কিন্তু সেরকম খারাপ না। ঘরের মাঝে কেন আসবাব নেই, যাকখানে শক্ত একটা কাঠের টেবিলের উপরে একটা স্টোভ, সেই স্টোভে চুকচুচে কালো একটা কেতলি। লোকটি স্টোভটা বারকংকে পাঞ্চ করে ঝালিয়ে দিল, শো শো শব্দ করে সেখান থেকে নীল আগুন বের হতে থাকে। কেতলিতে খানিকটা পানি ভরে লোকটি স্টোভের উপর ঢাপিয়ে দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে জিজেস করল, স্কুল থেকে আসছ?

আমাদের হাতে বই, কাজেই আমরা বে স্কুল থেকে আসছি বোধ খুব কঠিন নয়। আমরা মাঝে নাড়লাম।

কেন ফ্লাসে পড়?

সেভনে।

ভেরী গুড়। ভেরী গুড়। লোকটির খুব কেন জানি খুব খুশি খুশি দেখাতে থাকে। ফ্লাস সেভনে পড়া কেন এত খুশির ব্যাপার আমি ঠিক ধরতে পারলাম না।

নাম কি তোমাদের?

আমি সলীল।

আমি মুনীর।

ভেরী গুড়। ভেরী গুড়। লোকটি মনে হল আরো বেশি খুশি হয়ে গেল। মাথা নেড়ে হাসতে হাসতে বলল, আমার নাম জহরুল চৌধুরী। প্রফেসর জহরুল চৌধুরী।

জহরুল নামটা সলীল ঠিক ধরতে পারল না, জিজেস করল, প্রফেসর জারুল চৌধুরী?

লোকটা হা হা করে হেসে উঠে বলল, জারুল? ভালই বলেছ। জারুল! জারুল চৌধুরী! প্রফেসর জারুল চৌধুরী। হা হা হা . . .

আমি সলীলকে ধাক্কা দিয়ে বললাম, শাখা! জারুল না, জহরুল। জহরুল চৌধুরী। ও। ও। সলীল একটু লজ্জা পেয়ে বলল, জহরুল—

লোকটি মাঝে নেড়ে সলীলকে খামিয়ে দিয়ে বলল, না না, জারুলই ভাল! চমৎকার নাম। গাছের নামে নাম। জারুল চৌধুরী খুব ভাল শোনায়! কি বল?

বোধাই যাচ্ছে মানুষটা একটু পাগলা পোছের, কিন্তু ভাল মানুষ তাতে কেন সন্দেহ নেই। লোকটা হানিমুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, আজ থেকে তোমাদের কাছে আমার নাম জারুল চৌধুরীই হোক। প্রফেসর জারুল চৌধুরী।

আমি একটু ইতঃস্তত করে জিজেস করলাম, আপনি কিসের প্রফেসর?

আমি মাথমেটেরের প্রফেসর। গণিতশাস্ত্রের। অংকের। অংক ভাল লাগে তোমাদের?

অংক ভাল লাগে সেরকম কোন মানুষ কি সত্যি হওয়া সত্য? আমরা তবু ভদ্রতা করে মাঝে নাড়লাম, বললাম, জী। ভাল লাগে।

ফ্লাস সেভনে কি অংক শেখাব তোমাদের? ক্যালকুলাস?

আমরা মাঝে নাড়লাম, না।

প্রফেসর জারুল চৌধুরী মনে হল খুব অবাক হলেন। ক্যালকুলাস শেখায় না? ভাবি আশ্চর্য। যত ছেট ধাকতে সম্ভব ক্যালকুলাস শেখানো উচিত। ছেটেরা শিখবে খুব সহজে। আমি ভেবেছিলাম একটা বই লিখব, নাম দিব “শিশুদের ক্যালকুলাস”।

প্রফেসর জারুল চৌধুরী তাঁর বইয়ের বিষয়বস্তু কি হবে সেটা আমাদের বোঝাতে শুরু করলেন। আমরা ঠিক খুবাতে পারছিলাম না, তবু মাঝে নাড়তে ধাকলাম।

কেতলিতে পানি গরম হয়ে যাবার পর প্রফেসর জারুল চৌধুরী আমাদের টিনের মধ্যে চা তৈরি করে দিলেন। একটা প্যাকেট থেকে খানিকটা মুড়ি বের করে দিয়ে বললেন, স্কুল থেকে এসেছ, নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। আমার কাছে তো মুড়ি ছাড়া আর কিছু নাই। মুড়ি খাও তো তোমরা?

জী খাই।

আমরা মুড়ি খেতে থেকে চায়ে চুমুক দিলাম। টিনের মধ্যে চা খেতে হয় খুব সাবধানে, টেট পুড়ে যায় খুব সহজে। চায়ে কি চমৎকার গন্ধ! মনে হল পায়েশ খাচি। আমি চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, আপনি কলেজের প্রফেসর?

হ্যাঁ। প্রফেসর জারুল চৌধুরী মাঝে নাড়লেন, এক সময়ে ছিলাম। এখন আর না।

রিচার্ড করেছেন?

বলতে পার এক ধরনের রিচার্ড।

আমরা চা খেতে থেকে প্রফেসর জারুল চৌধুরীর সাথে কথা বলতে লাগলাম। একজন প্রফেসর, তাও যাতা প্রফেসর না, অংকের প্রফেসর, আমাদের সাথে এমনভাবে কথা বলছেন যেন আমরা ছেট নই, তাঁর সমবয়সী! আমরা একেবারে মুগ্ধ হচ্ছে গেলাম।

আমরা হয়তো আরো কিছুক্ষণ কথা বলতাম কিন্তু হঠাৎ টেবিলের নিচে পা লেগে কি একটা পড়ে গেল, আমি মাঝে নিচু করে দেবি, একটা ছেট বাঁজ, ভিতরে ভাঙা কাঁচের বোতল। জারুল চৌধুরী বললেন, ওটা কিছু নয়। ভাঙা কাঁচের টুকরা। ঘরের ভিতরে রাখাই ঠিক হয়নি।

ভাঙা কাঁচ দিয়ে কি করবেন?

সৃতায় মাঙ্গা দেব।

আমি আর সলীল চোখ বড় বড় করে তাকালাম, কিসে মাঙ্গা দেবেন?

সৃতায়। ঘূড়ির সৃতায়। ঢাউস একটা ঘূড়ি কিনে এনেছি, এই এত বড়, জারুল চৌধুরী দুই হাত দিয়ে দেখালেন।

হঠাৎ করে আমার একটা সন্দেহ হতে থাকে, মানুষটা নিশ্চয়ই পাগল। তা না হলে

এককম বর্তমান মানুষ সৃতায় মাঝে ঘূঁটি উড়ায়? হাতে দাঢ়ী ঘড়ি পরে, গলায় গায়জ ঝুলিয়ে রাখে? আমাদের মত বাক্তা ছেলেদের সাথে এককম ভাল ব্যবহার করে? আমি আড়চোখে সলীলের দিকে তাকালাম, দেখি তার মুখও কেমন জানি ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, সেও নিশ্চয়ই বুকতে পেরেছে। তোক গিলছে একটু পর পর।

চা প্রায় শেষ হবে আসছিল, আমি চকচক করে তাকিটা শেষ করে উঠে দাঢ়িয়ে বললাম, আমাদের যেতে হবে। দেরি হয়ে গেছে।

সলীলও সাথে নাথে উঠে দাঢ়িল। তোক নিলে বলল, হ্যাঁ। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

জাফল চৌধুরী বাইরে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, মনে হয় দেরি হয়ে গেছে।

আমরা মাথা নেড়ে বইপত্র হাতে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। ভয় হচ্ছিল, হাসিখুশি মানুষটা হাঁটাৎ বুঝি কেপে উঠে চিংকার করে লাফিয়ে পড়বে। হাতে ধাককে একটা রায় দা, এক কোপে আমাদের গলা আলাদা করে দেবে। কিন্তু সেরকম কিছু হল না। আমাদের ভাল মানুষের মত দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বললেন, ঠিক আছে সলীল আর মুনীর, বাসার যাও এখন। খুব ভাল লাগল তোমাদের সাথে কথা বলে।

আমি আর সলীল গুটিগুটি সিড়ি বেয়ে নেয়ে এলাম। নদীর ঘাটে এসে সলীল একটা নিষ্পত্তি কেলে বলল, মানুষটা আসলে পাগল। তাই না?

আমি মাথা নাড়লাম। কেমন জানি আমার একটু মন খারাপ হল।

বাসায় এসে দেখি, টেন ফেল করেছেন কলে বাবা ঢাকা যেতে পারেননি। আমাকে দেখে তার চোখ কেমন জানি চকচক করে উঠল। মুখে গোল টেনে বললেন, আয় হারামজাদা, আজ বাসায় আয়। কখন স্কুল ছুটি হয়েছে আর তুই এখন বাসায় আসিস? আজকে তোর একদিন কি আমার একদিন।

শিউলী গাছের নিচের ভালগুলি সব ভেঙে শেষ করে নেয়া হয়েছে, বাবাকে অনেক কষ্ট করে উপর থেকে একটা ভাল ভাঙতে হল।

তারপর আমাকে যা একটা মার মারলেন, সেটা আর বলার মত না।

৪. জয়নাল

সকালে স্কুলে যাবার সময় দেখি জয়নাল আমাদের বাসার সিড়িতে বসে আছে। জয়নাল আমাদের বাড়িওয়ালার কাছের ছেলে। আমাদের বাড়িওয়ালা একজন উকিল, নাম গজনফর আলী, সবাই গজু উকিল বলে ভাকে। উকিল সাহেবের মনে হয় পশাৰ খুব বেশি নেই, সংসার চালানোর জন্যে তার ওকালতি ছাড়াও আরো নানারকম

কাজকর্ম করতে হয়। আমরা তার ভাড়া বাসাতে থাকি। শীতের সময় উকিল সাহেবের গবুর গাড়ি করে গ্রাম থেকে ধান আনেন। তার বাসায় একটা গাইগুর আছে, তিনি সেই গুরুর দুধ বিক্রি করেন। জয়নালকে তাখা হয়েছে এই গুরুটাকে দেখাশোনা করার জন্যে।

উকিল সাহেবের গুরুটা খব দুবলা, বাছুরটা তার থেকেও দুবলা। প্রত্যেকদিন সকালে দুধ মোওয়ানোর জন্যে বন্দাবন নামে একজন খুন্দুরে বুড়ো মানুষ আনে। শুকনো হাড় জিরঞ্জিরে গুরুটা থেকে বন্দাবন কিভাবে কিভাবে জানি ছেট একটা বালতিতে আধ-বালতি দুধ বের করে ফেলে। সেই দুধে পানি মিশিয়ে পুরো বালতি করে দুধ বিক্রি করা হয়। দুধে যে পানি মেশানো হয় সেই খবরটাও আমরা জয়নালের কাছে পাই। উকিল সাহেবের কথামত সেই মিশায়। দুধে নাকি একটু পানি মেশাতে হয়, একেবারে খাঁটি দুধ নাকি আছের জন্যে ভাল না।

জয়নালের বয়স আয়ার থেকে বেশি হবে না, কিন্তু তাকে দেখার অনেক বড়। প্রথম কারণ, সে সব সময় লুকি পরে থাকে, লুকি পরলে মানুষকে কেন জানি একটু বড় দেখায়। যখন আশেপাশে কেউ থাকে না তখন সে লুকির গোজ থেকে সিগারেট বের করে আছ। তার সিগারেট খাওয়াটা একটি দেখার মত দৃশ্য, চোখ বক করে এমন একটি ভাব করতে থাকে মেল সিগারেট নয়, রসগোল্লা আছে।

জয়নাল এখনিতে খুব হাসিখুশি ছেলে। কিভাবে এত হাসিখুশি থাকে কে জানে। যেভাবে থাকে সেখানে হাসিখুশির কিছু নেই। আজকে অবিশ্বিত তাকে হাসিখুশি দেখাচ্ছে না। সিড়িতে মুখ্য শোমড়া করে বসে আছে, সামনে তার হাড়জিরঞ্জিরে গুরু। গুরুটার দড়ি তার হাতে। কাছেই বাছুরটা দাঢ়িয়ে আছে, গুরুটা তার বসখাসে জিব দিয়ে বাছুরটাকে চেটো যাচ্ছে, শব্দ শুনে মনে হয় চামড়া তুলে ফেলবে। বাছুরটার মুখে একটা উদাস উদাস ভাব, দেখে মনে হয় কেমন জানি এক ধরনের শান্তি এসে তব করেছে!

আমি বললাম, কি বে জয়নাল!

জয়নাল আমার দিকে তাকিয়ে নালিশ করার ভঙ্গিতে বলল, শালার বাছুরটার কারবারটা দেখেছেন?

বদিও তার বয়স আমার কাছাকাছি তবুও সে আয়াকে আপনি করে বলে, আমি তাকে তুই করে বলি। কাজের ছেলেদের এভাবেই বলা হয়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে?

দড়ি ছিড়ে রাতে সব দুধ খেয়ে ফেলেছে। পেটটা দেখেছেন?

আমি বাছুরটার দিকে তাকালাম। সত্ত্বাই পেটটা ফুলে ছেট একটা জেলের মত হয়ে আছে। চেহারায় সে জন্যেই মনে হচ্ছে শান্তশিষ্ট ভালমানুষ সুবী সুবী চেহারা। আমি দাত বের করে হেসে বললাম, ঠিক করেছে। একফোটা দুধ থেকে নিস না বাছুরটাকে, দড়ি ছিড়বে না তো কি? মায়ের দুধ তো তার বাচ্চাই থাবে —

জয়নাল মুখ বাকা করে বলল, আর মারটা? সেটা কে থাবে?

আমি আর কথা বাড়লাম না। বড়দের হাতে মার খাওয়া ব্যাপারটা শুধু আমার

জন্ম সত্ত্ব না, আরো অনেকের জন্ম সত্ত্ব। বানিকশ্চপ বাচ্চুরের জেলের যত পেটাকে দেখে স্বচ্ছে ঘাস্তিলাম, জয়নাল পিছন থেকে ডেকে বলল, ভাই, মনির ভাই।

কি?

আজকে একটা চিঠি লিখে দেবেন?

বেহেতু জয়নাল পিষ্টতে পড়তে পারে না, আমি তাকে মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লিখে দিই। সে তার বাড়িতে যখন টাকা পাঠায় আমি তার মানি অর্ডার ফরম ফিলআপ করে দিই। সহজে অবিশ্বিত রাজি হই না, সবসময় প্রথমে বানিকশ্চপ গাইগুই করি। আজকেও শুরু করলাম, বললাম, আবার? সেই দিন না লিখে দিলাম?

সেইদিন কি বলেন? কার্ডিক মাসে দিলেন। এখন অগ্রহায়ণ।

আমার বাংলা মাসের হিসেব ভাল থাকে না। মুখে একটা বিরক্তির ভাব ঘৃণিয়ে শেষে বললাম, ঠিক আছে, বিকালে নিয়ে আসিস।

জয়নাল একেবারে গলে খাওয়ার ভান করে বলল, ঠিক আছে মনির ভাই। ঠিক আছে।

বিকাল বেলা জয়নাল একটা মানি অর্ডার ফরম আর একটা স্কুলেভূমি কাগজ নিয়ে হাজির হল। বারান্দায় বসে আমি তার মানি অর্ডার ফরে লিখতে থাকি। কন্ত টাকা পাঠাই জিজেস করতেই হঠাত জয়নাল কেমন যেন অব্যক্তিতে একটু নড়েচড়ে বসল। আমি আবার জিজেস করলাম, কত পাঠাবি?

তিনশ।

তিনশ? আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, এত টাকা কোথায় পেয়েছিস?

জয়নালের বেতন কত আমি খুব ভাল করে জানি। উকিল সাহেব বলতে গেলে তাকে পেটে-ভাতে রেখেছেন। জয়নাল মুখ কাচুচাচ করে মাথা চুলকে বলল, পেয়েছি এক জাহাগা থেকে।

কেন, জাহাগা থেকে?

জয়নাল আমতা আমতা করে বলল, বলা নিষেধ আছে মনির ভাই।

চুরি করেছিস?

সাথে সাথে জয়নালের মুখ কাল হয়ে যায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, মনির ভাই, আপনার তাই মনে হয়? মানুষ গরিব হলেই চুরি করে?

তাহলে বলছিস না কেন?

চুরি করিনি। জয়নাল জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, খোদার কসম চুরি করিনি। আল্লাহর কসম। খোদার কীরা।

তাহলে? তিনশ টাকা?

মনির ভাই, আমার বলা নিষেধ। আমি পেয়েছি এক জাহাগার। ন্যায় টাকা।

হালাল রঞ্জি। খোদার কসম।

ঠিক আছে। আমি মুখ শক্ত করে বললাম, আমাকে যদি বলতে না চাস বলিস না। আমি উকিল সাহেবকে জিজেস করব।

সাথে সাথে জয়নালের মুখ একেবারে কাঁদো কাঁদো হয়ে যাব। একেবারে আমার হাত ধরে ফেলে বলল, আল্লাহর কসম লাগে আপনার মনির ভাই, উকিল সাহেবের কিছু জিজেস করেন না। যদি করেন আমার সব টাকা নিয়ে যাবে। গরিব মানুষের টাকা। এত কষ্টের টাকা।

আমি চোখ পাকিয়ে বললাম, তাহলে বল কোথায় পেয়েছিস।

জয়নাল বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আপনি কাউকে বলবেন না?

বলব না?

খোদার কসম?

খোদার কসম।

জয়নাল মাটি থেকে একটা কাঠি তুলে খুব মনোযোগ দিয়ে দাত খৌচাতে খৌচাতে বলল, আমি গরু নিয়ে নদীর পাড়ে যাই মাঝে মাঝে। নদীর ঘাটে বিনতির কাজ করে কিছু পোলাপান। একজনের নাম রশীদ।

জয়নাল পিচিক করে দাতের ফাঁক দিয়ে ঘৃত ফেলে বলল, রশীদ শালার সৎ মা। বাপ রিকশা চালায়। ভাত খাওয়ার পয়সা নাই। হঠাত দেখি নবাবের বাঢ়া একটা নতুন শার্ট আর লুঙ্গি পরে এসেছে। পকেটে চিকিৎসী। নদীর ঘাটে চায়ের দোকানে বসে মালাই দিয়ে চা থাকে। আমি জিজেস করলাম, টাকা কই পেলি? চুরি করেছিস? রশীদ কিয়া কেটে বলল চুরি করে নাই। আমি জিজেস করলাম, তাহলে? প্রথমে বলতে চায় না, শালারে অনেক তেল মালিশ করলাম। তখন বলল।

কি বলল?

বলল, সুতরাপুরের কাছে গ্রীন মেডিকেল ক্লিনিক আছে, সেখানে বড় ডাক্তারের নাম নাওয়াজ খান। নাওয়াজ খান দিয়েছেন।

নাওয়াজ খান টাকা দিয়েছেন?

জে।

কেন?

জয়নাল ঠোঁট উঠিয়ে বলল, জানি না। নাওয়াজ খান সাহেব এমনিতে ফিরিশতাৰ মত মানুষ। বোশনাই চেহারা। পরিব পোলাপানদের খুব আদর যত্ন করেন। কেউ যদি খান সাহেবের কাছে যায় খান সাহেব সাহায্য করেন। খালি কিয়া কেটে বলতে হয় কাউরে বলা যাবে না। সেই জন্মে আপনারে বলতে চাই নাই।

কাউকে বলা যাবে না?

না।

কি বলা যাবে না?

এই যে টাকাপয়সা দেন, সাহায্য করেন—সেই কথা।

কেন?

ফিরিশতার ফিসিমের মানুষ, জানাজানি করতে চান না যানে হয়।

গেলেই টাকা দেন?

জয়নাল একটু আমতা আমতা করে বলল, গেলেই সব সময় দেন না। মাকে মাকে দেন। কেউ বেশি কেউ কম?

কেউ বেশি কেউ কম?

জে।

কেন?

জয়নাল মাথা নেড়ে বলল, খান সাহেবের ইচ্ছা!

আমি তবু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, যার বেশি দরকার তাকে বেশি?

জে না। সেইভাবে না।

তাহলে কিভাবে?

জয়নাল খান সাহেব আগে সবাইকে টিপে চুপে পরীক্ষা করেন। তারপর রক্ত পরীক্ষা করেন। এঙ্গ-রে করেন। একটা ছেট বোতলে পেশাব করে দিতে হয়। সেই সব কিছু পরীক্ষা করেন। একটা কাগজে তারপর নাম ঠিকানা লিখেন। ক্যামেরা দিয়ে ফটো তুলেন তখন। তারপরে—

তারপরে কি?

তারপরে টাকা দেন। কেউ বেশি কেউ কম। খালি একটা শর্ত।

কি শর্ত?

যখন নাওয়াজ খান সাহেব খবর পাঠাবেন তখন যেতে হবে।

আমি ভুলু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

জানি না। সব ঠিক আছে কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখেন মনে হয়।

তুই কি বেশি পেঁচেছিস না কম?

জয়নাল দাত বের করে হেসে বলল, বেশি।

আমি জয়নালের কথা শুনে একটু অবাক হলাম। নানা রকম সন্দেহ হল, কিন্তু একটা ছেলের রক্ত, কফ, পেশাব পরীক্ষা করা, এঙ্গ-রে — এর মাঝে সন্দেহ করার কি আছে? কে জানে, আসলেই নাওয়াজ খান মানুষটা হয়তো ফিরিশতার যত। মানুষের উপকার করতে চান, গরিব বাঢ়াদের সাহায্য করতে চান। বাবাকে দেখে আমার মনে হয় মন বিধিয়ে গেছে, সব মানুষকেই শুধু সন্দেহ করি।

জয়নাল মুখ কাচুমাচু করে বলল, আপনি কাউকে বলবেন না তো?

না।

খোদার কসম?

খোদার কসম।

জয়নালের মুখটা আবার তখন হাসি হাসি হয়ে গেল। পিচিক করে একবার খুতু ফেলে বলল, নাওয়াজ খান সাহেব বলেছেন, জানাজানি হয়ে গেলে আর এক পয়সাও দিবেন না।

তব পাস না। জানাজানি হবে না।

আমি জয়নালের মানি অর্ডার ফরম লিখে তার চিঠিও লিখে দিলাম। চিঠি লিখে লিখে তার ভাইবোন সবার নাম, কে কি করে, সবকিছু আবার জানা হয়ে গেছে। বাবা নেই, বড় ভাই একটা অপদার্থ, টাকাপয়সা নষ্ট করে। বার বার চিঠিতে তার মাকে সেটা সাবধান করে দেয়। ছেট একটা বোন, রওশন, স্কুলে যায়, খুব পড়াশোনার শখ। রওশনের জন্যে তার খুব যায়। সে বেন স্কুলে যায়, পড়াশোনা করে, সেটা বারবার করে লিখতে থাকে। যেহেতু সে নিজে লেখাপড়া জানে না, তার চিঠি লিখে দেয়া খুব শক্ত ব্যাপার। একটা কথাই নে বাববার বলতে থাকে। কথায় গুরুত্ব দেয়ার জন্যে মুখ্য একটা কথা কয়েকবার বলা যায়। কিন্তু চিঠিতে একটা কথা কয়েকবার আবার কেমন করে লিখে? কিন্তু জয়নালের চিঠিতে সেটাই করতে হয়। তাকে খুকিয়েও কোন লাভ হত না। আজকে এক জাতীয় লিখতে হল—

... রওশনের দিকে বিশেষ নজর দিবেন। বিশেষ নজর দিবেন। স্কুল ঘেন সময়মত যায়। পড়ালেখা ঘেন করে। সেই জন্য বিশেষ নজর দিবেন। পড়ালেখাম নজর দিবেন। স্কুল ঘেন যায়। সেই দিকে বিশেষ নজর দিবেন। বইপুস্তক লাগিলে কিনিয়া দিবেন। টাকা পাঠাইলাম। বইপুস্তক কিনিবেন। বিশেষ নজর দিবেন....

আমি আজকাল আর আপত্তি করি না, বাই বলে তাই লিখে দিই। চিঠি লেখা শেষ হলে তাকে পড়ে শোনাতে হয়। সে তখন খুব গান্ধির হয়ে মাথা নেড়ে বলে, মনির ভাই, আপনি খুব ভাল চিঠি লিখেন। একেবারে ফাস কেপাশ।

৫. গাছঘর

অংক ক্লাসে সলীল ফিসফিস করে বলল, একটা ঝামেলা হয়ে গেছে।

আমিও ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, কি ঝামেলা?

মনে আছ সেই বইটা?

কোন বইটা?

নীল নয়নার অভিসার। তোকে দেখিয়েছিলাম?

আমার মনে পড়ল, বাবা বাসায় ছিলেন বলে বইটা পড়তে নিতে পারিনি। জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে সেই বইটার?

খুঁজে পাইছি না।
খুঁজে পাইছিস না?
না।
সর্বনাশ।

হ্যাঁ। কাল ফেরৎ দিতে হবে। সলীল শুকনো মুখে বলল, না হয় সঞ্চয়দা আমাকে
ধরে একেবারে কাঁচা খেয়ে ফেলবে। লাইনের থেকে এনেছিল।

কোথায় হারিয়েছিস?

আনি না। সব জায়গায় খুঁজে ফেলেছি। কোথাও নাই। আমার কি মনে হয়
জানিস?

কি?

জান্মল চৌধুরীর বাসায় ফেলে এসেছি।

আমি চোখ বড় বড় করে তাকালাম, জান্মল চৌধুরী?

হ্যাঁ। সলীল মুখ কাছুমাছু করে আমার দিকে তাকাল, কিছু বলল না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখন তোর জান্মল চৌধুরীর বাসায় যেতে হবে?

সলীল যাথা নাড়ল। তাপ্তির মুখ আরো কাছুমাছু করে আমার দিকে তাকিয়ে গইল।
আমি বিছুক্ষণ চূপ করে থেকে বললাম, তুই চাস আমি তোর সাথে যাই?

সলীল জোরে জোরে যাথা নাড়ল।

কখন যেতে চাস?

সময় নাই। চিফিন ছুটির সময় যেতে হবে।

ক্লাস ফাঁকি দিয়ে?

সলীল আমার এমনভাবে মুখ কাছুমাছু করে তাকাল যে আমি আর না করতে
পাবলাম না।

চিফিন ছুটির সময় আমি আর সলীল আলাদা আলাদাভাবে ক্লাস থেকে সাবধানে
বের হয়ে এলাম। ক্লাসে এত ছেলে, আমাদের কেউ যদি খোজ না করে, ধরা পড়ার
কোন ভয় নেই। সাবাইকে ঝালিয়ে শুনিয়ে হৈ হৈ চৈ করে কখনো ক্লাস থেকে পালানো
যায় না, কিন্তু গোপনে, কাউকে না আনিয়ে সটকে পড়া এমন কিছু কঠিন ব্যাপার না।
তাছাড়া আমি তো আর স্কুল ফাঁকি দেওয়ার জন্যে যাইছি না, যাইছি বন্ধুকে বিপদে
সাহায্য করার জন্যে। একজন পাগল যানুষের বাসায় তো আর সলীলকে একা যেতে
দিতে পারি না। হঠাৎ যদি রাম দা হাতে নিয়ে ঘাঁপিয়ে পড়ে জান্মল চৌধুরী? কেটে যদি
পুতে ফেলে? দুইজন থাকলে তবু কিছু একটা করা যাবে, একা থাকলে কোন উপযাই
নেই।

হেঁটে হেঁটে যাবার সময় যখন সুতরাপুরের ভিতর দিয়ে যাইছি তখন রাত্তির পাশে
একটা ফাঁকা জায়গায় দোতলা সালা একটা দালান চোখে পড়ল। গেটের উপর একটা

বড় বোর্ড লেখা, “শ্রীন মেডিকেল ক্লিনিক”। এটাই নিশ্চয়ই জয়নালের মেই ক্লিনিক,
যেখানে পরিব বাচ্চাদের নানারকম পরীক্ষা করে টাকাপয়ান দেয়। আমি যেতে যেতে
ক্লিনিকটাকে ভাল করে দেখলাম। পরিষ্কার পরিচ্ছম চকচকে সোতলা একটা দালান।
জ্বাগাটা অবিশ্য একটু বেশি নিরবিলি। দেয়াল দিয়ে থেরা বড় একটা জ্বাগা, ভিতরে
নান রকম গাছপালা। ক্লিনিকটা দেখে মনে হয় নির্জন, ভিতরে কোন গোপী আছে বলে
মনে হয় না। কোন রকম গোপী না পেলে এই ক্লিনিক কেমন করে চলবে কে জানে!

সলীল আমাকে জিজ্ঞেস করল, কি দেখছিস?

না কিছু না — বলেও আমি ঘাড় খুরিয়ে শ্রীন মেডিকেল ক্লিনিকটাকে দেখতে
থাকি। দোতলায় মনে হল একটা বাকা ছেলে হেঁটে যাচ্ছে, সাথে পরিষ্কার কাপড় পরা
একজন মানুষ। কে জানে, এই মানুষটাই হয়তো ভাঙ্গার নাওয়াজ খান। জয়নালের
ভাবায় ফিরিগতার কিসিমের মানুষ।

সলীল আমার জিজ্ঞেস করল, কি দেখছিস?

নাহ কিছু না। বলেও আমি সেলিকে তাকিয়ে রইলাম।

কিছু না যানে? সলীল একটু রেখে বলল, মেই তখন থেকে ঘাড় ধাকা করে
দেখছিস, আর বলছিস কিছু না।

না, যানে, বলা নিষেধ।

কি বলা নিষেধ?

একটা জিনিস যদি বলা নিষেধ হয় সেটা কেমন করে বলি? যদি বলা হয় সেটা কি
নিষেধ মানা হল?

সলীল কি রকম আনি কৌতুহলী হয়ে আমার দিকে তাকাল, তারপর বলল,
আমাকে বললে কতি কি? আমি কি কাউকে বলে দেব? কখনো দিই?

আমার নিজেরও জয়নালের কথাটা কলার জন্যে মুখটি সূক্ষ্ম করছিল, তাই শেষ
পর্যন্ত সলীলকে বলে দেয়াই ঠিক করলাম। বললাম, ঠিক আছে, তোকে বলতে পারি।
তুই কাউকে বলবি না তো?

না।

যোদার কসম?

যোদার কসম। ভঙ্গবানের কীরা।

আমি তখন সলীলকে জয়নালের কথাটা খুলে বললাম। কেমন করে সে শ্রীন
মেডিকেল ক্লিনিকে যায় এবং কেমন করে ভাঙ্গার নাওয়াজ খান তাকে টিপে টুপে
পরীক্ষা করে টাকাপয়ান দিয়ে সাহায্য করেন। সব শুনে সলীল একেবারে মুশ্টি হয়ে
গেল। চোখ বড় বড় করে বলল, সত্য? সত্যি?

সত্যি। আমি নিজে জয়নালের মানি অর্ডার ফরম ফিলআপ করে দিয়েছি। আমি
আনি। তোর কি মনে হয় সলীল, নাওয়াজ খান মানুষটার কি কোন বদ মতলব আছে?

বদ মতলব? সলীল চোখ কপালে তুলে বলল, বদ মতলব কেন থাকবে? একজন

দেবতার মত মানুষ, গরীব বাঢ়াদের সাহায্য করছে, আর তুই বলছিস বদ মতভব? আমাখা কি আর কেউ কাউকে সাহায্য করে? খোজ নিয়ে দেখ, নিশ্চয়ই কোন না কোন বদ মতভব —

সলীল বেগে গিয়ে বলল, তোর মনটাই প্যাচালো। কোন ভাল জিনিস দেবিস না। পৃথিবীতে যত জন খারাপ মানুষ তার থেকে অনেক যেশি ভাল মানুষ, সেটা জানিস?

আমি নাথা নাড়লাম, জ্ঞানি না।

তাহলে জেনে রাখ। গাধা কোথাকার।

আমি আর তর্ক করে কথা বাঢ়লাম না। সত্যিই যদি পৃথিবীতে ভাল মানুষ বেশি থাকে, ব্যাপারটা খারাপ হয় না। কিন্তু আমার সেটা নিয়ে সন্দেহ আছে।

সলীল হেঁটে যেতে যেতে বলল, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। কি আইডিয়া?

মনে আছে পারভেজ স্যার যে একটি রচনা লিখতে দিয়েছেন?

আমি নাথা নাড়লাম, মনে আছে। পারভেজ স্যার একজন কমবয়সী স্যার, নতুন এবেছেন, সব ব্যাপারে খুব উৎসাহ। আমাদের নানারকম বিচিৎ জিনিস নিয়ে রচনা লিখতে দেন। গত সপ্তাহে রচনার বিষয়বস্তু ছিল “আমি যদি পোকা হতাম”, এর আগের সপ্তাহে ছিল “নিউটনের যদি একটা কম্পিউটার থাকত”! খুব মজার বিষয়বস্তু, লিখতে গিয়ে আমাদের এবন সব ব্যাপার চিন্তা করতে হয় যেতো আগে কোনদিন চিন্তা করিনি। সেই তুলনায় এই সপ্তাহের বিষয়টি অনেক সোজা — “আমার দেখা একজন আটি মানুষ!” আমি কাকে নিয়ে লিখব সেটা এখনো ঠিক করিনি। সলীল মনে হয় ঠিক করে ফেলেছে। জিজ্ঞেস করলাম, কাকে নিয়ে লিখবি।

নাওয়াজ খান।

কিন্তু তুই তো তাকে এখনো ঠিকিস না। তোকে লিখতে হবে এমন একজন মানুষকে নিয়ে যাকে তুই ঠিকিস।

সেটাই তো আইডিয়া। কাল পরশু কোন একদিন গিয়ে নাওয়াজ খানের সাথে পরিচয় করে আসব —

না — আমি জোরে নাথা নেতে বললাম, তুই কথা দিয়েছিস জয়নালের কথা কাউকে বলবি না, তুই কিছুতেই মেতে পারবি না। কিছুতেই না।

আমি জয়নালের কথা বলব না, একটা কথাও বলব না। এই খুক ছুয়ে বলছি।

তাহলে কি বলবি?

কিছু বলব না। শুধু জিজ্ঞেস করব দেশের উপকার করার জন্যে কি করা যাব সেটা নিয়ে কি ভাবেন? তখন নিজে থেকেই হয়তো বলবেন।

আর যদি না বলেন?

না বললে নাই, তাহলে অন্য কাউকে নিয়ে লিখতে হবে।

ব্যাপারটা আমার ঠিক পছন্দ হল না, কিন্তু সেটা নিয়ে ঠিক কি করা যায় বুঝতে



পোরলাম না।

জারুল চৌধুরীর বাসায় গিয়ে তাকে খুঁজে পেলাম না। নিচে নেই, উপরে নেই, ভয়ে ভয়ে ঘরের দরজা ধাক্কা দিয়ে দেখি, দরজা খোলা, ঘরের ভিতরে কেউ নেই। যখন চলে আসছিলাম তখন শুনি, কোথা থেকে জানি ঠকঠক করে শব্দ হচ্ছে। শব্দ যেদিক থেকে আসছে সেদিকে গিয়েও কিনু খুঁজে পেলাম না। যখন চলে আসছিলাম, হঠাৎ শুনি জারুল চৌধুরীর গলা, টিংকার করে ভাকছেন, এই যে সলীল ! মূলীর !

আমরা এদিক সেদিক তাকিয়ে তাকে খুঁজে পেলাম না। কোথা থেকে কলছেন ? এই যে আমি এখানে ! উপরে !

আমি আর সলীল অবাক হয়ে উপরের দিকে তাকালাম, দেখি, দূরে বিশাল একটা গাছের ডাল পাতার ফাঁক থেকে জারুল চৌধুরী আমাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছেন। আমি আর সলীল এগিয়ে গেলাম, কাছে গিয়ে দেখি, গাছের মোটামোটা তিনজন ডালের মাঝখানে একটা ছোট ঘর তৈরি করা হচ্ছে। ঘরটি এখনো শেষ হয়নি, দু পাশের দেয়াল আর উপরের ছাদ এখনো বাকি। কিন্তু এটা যে একটা ঘর তাতে কোন সন্দেহ নেই। জারুল চৌধুরীর মাথায় লাল গাঢ়জাটি ধীরা, হাতে একটা হাতড়ি, সেটা দিয়ে নিশ্চয়ই কোথাও পেরেক টুকছিলেন। আমরা বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে গেলাম। বইপত্রে লেখা কোথাও দেখেছি মানুষ গাছের উপর ঘর তৈরি করে, তাই বলে সত্য সত্যি ?

সলীল ফিসফিস করে বলল, হবই সুইস ফেমিলি রবিসন ! মনে আছে ?

আমি মাথা নাড়লাম, জারুল চৌধুরী গাছের উপর থেকে বললেন, তারপর মানিকজোড়, কি মনে করে ?

সলীল তখনো কথা বলতে পারছিল না, কেনন মতে একটা বড় নিষ্কাস নিয়ে চাপা গলায় বলল, কি সুন্দর ! আহা কি সুন্দর !

জারুল চৌধুরী হো হো করে হেসে বললেন, উপরে আসবে ?

আমরা দূরে জোরে মাথা নাড়লাম। আগে ধারণা ছিল মানুষটি পাগল, কিন্তু যে গাছের উপর এত সুন্দর ঘর তৈরি করতে পারে সে আর যাই হোক পাগল না। আর যদি পাগল হয়েই থাকে তাহলে পরিষ্কারে এরকম পাগলেরই দরকার।

আমরা ডাল বেয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম, জারুল চৌধুরী মাথা নেড়ে বললেন, দীড়াও, দড়ির মহিজা নামিয়ে দিই।

জারুল চৌধুরী উপর থেকে একটা দড়ির যই নামিয়ে দিলেন। দুটি মেঁজি দড়ির মাঝখানে খাশের শক্ত কঁকি বেঁধে যই তৈরি করা হয়েছে। এত চমৎকার যে আমরা একেবারে মুঠ হয়ে গেলাম। যই দিয়ে প্রথমে আমি, আমার পিছনে সলীল উঠে গেল। উপরে খোলামেলা একটা ঘর তৈরি হচ্ছে, শক্ত কাঠের মেঁকে, চারপাশে দেয়াল। একদিকে একটা জানালা, ছাদ তৈরি করার জন্যে কাঠ পাতা হয়েছে, ঢেকে দেয়া

বাকি।

জারুল চৌধুরী চশমার ওপর দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখে বললেন, কি মনে হয় তোমাদের ? আমার নতুন বাসা—

আপনার বাসা ? আপনি এখানে থাকবেন ?

হ্যাম ! জারুল চৌধুরী এক ধরনের বহস্যের মত ভঙ্গি করে মাথা নেড়ে বললেন, যখন ছোট ছিলাম তখন খুব শখ ছিল গাছের উপর একটা ঘর তৈরি করব। ছেলেবেলায় আর তৈরি করতে পারিনি। এখন এত সময়, ভাবলাম গাছের উপর ঘর একটা তৈরি করে ফেলি। পরে আফসোস রয়ে যাবে, তাহলে যেরে আবার কুতু হয়ে ফিরে আসতে হবে। কি, ভাল হচ্ছে না ?

আমরা এত মুঠ হয়ে দেখছিলাম যে, একেবারে কেনন কথাই বলতে পারছিলাম না।

জারুল চৌধুরী হাত দিয়ে দেখালেন, এই যে এখানে হবে আরেকটা জানালা। আর এই যে ছাদ। দড়ির একটা বিছানা থাকবে, শুয়ে শুয়ে বই পড়ব। বাত্রে শুমাতে চাইলে মিলিং ব্যাপ ?

মিলিং ব্যাপ ?

হ্যা, মিলিং ব্যাপ জান তো কি ?

সলীল মাথা নাড়ল, হ্যা, জানি। বইয়ে পড়েছি। ব্যাপের মত থাকে, ভিতরে শুমায়। ঠাণ্ডা লাগে না।

হ্যা, আর এখানে একটা ছোট শেলফের মত হবে, সেখানে বইপত্র, শুকনো খাবার।

আমরা হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, জারুল চৌধুরীর ডান হাতের তাঙ্গুতে একটা ব্যাণ্ডেজ, মনে হয় কোনভাবে কেটে গিয়েছে। আমি ভিজেস করলাম, আপনার হাতে কি হয়েছে ?

জারুল চৌধুরী কেমন মেল লজ্জা পেয়ে গেলেন, মাথা নেড়ে বললেন, আর বল না, গত সপ্তাহে একটা ডাউস শুড়ি তৈরি করে উড়াচ্ছি। সৃতার মাঝা দিয়েছি আজ্ঞা যত, সৃতা তো নয়, একেবারে ধারালো চাকু ! বেশ ভালই উড়চিল, চারটা শুড়ি কেটে দিলাম, হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই গোস্তা খেল নিচের দিকে, প্রথমে সৃতাটা একটু সিল দিয়ে যেই হেডেছি হঠাৎ সীই সীই করে উঠতে লাগল, হাত দিয়ে ধরতে গেলাম, মাঝা দেয়া সৃতায় হাত কেটে একেবারে রক্তারণি !

সলীল বলল, ইশ !

বুড়ো মানুষদের বাচ্চা হওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। যখন বাচ্চা ছিলাম তখন কাজ ওলি কি সহজ ছিল, এখন যত্নই দিন যাচ্ছে ততই কঠিন হয়ে যাচ্ছে !

জারুল চৌধুরী মানিকজোড় নিজের ব্যাণ্ডেজ করা হাতটি দেখে বললেন, তারপর তোমরা মানিকজোড়, কি মনে করে ? শ্বেত পালিয়ে ?

সলীল তার বইয়ের কথা কলতে যাচ্ছিল, জারুল চৌধুরী হাত তুলে থামিয়ে দিলেন। বললেন, বুঝেছি। সীল নয়নার অভিনান ! তাই না ?

আমরা যাথা নাড়লাম, মনে হল এখন বুঝি আমাদের ধমকে সেবেন এরকম একটা বই পড়ার জন্যে, কিন্তু ধমকে দিলেন না বরং হাসি হাসি মুখে বললেন, অনেকদিন এরকম একটা বই পড়িনি, তাই দেবিন বসে বসে পড়ে ফেললাম।

সলীল কোন কথা বলল না, জারুল চৌধুরী যাথা ঝাকিয়ে বললেন, কাহিনীটা জানি কি রকম ! সীল নয়না ঢাকু দিয়ে তার ভালবাসার মানুষের বুক কেটে ফেলল, তারপর রক্তে হাত ভিজিয়ে বলল, যেও না যেও না ওগো—সেটা কি করবো হয় ?

সলীল দুর্বিভাবে যাথা নাড়ল, কয়েকদিন আগেই সে আমাকে বোকানোর চেষ্টা করছিল কি দারুণ এই বইটা, কি চমৎকার তার ভাষা, কি সংঘাতিক তার কাহিনী ! কিন্তু এখন জারুল চৌধুরীর সামনে সে একেবারে চুপ মেরে রহিল, একবারও প্রতিবাদ করল না।

জারুল চৌধুরী মনে হল বইয়ের কাহিনীটার কথা চিন্তা করে একবার একটু শিউরে উঠলেন, তারপর বললেন, যাবার সময় নিয়ে যেও বহাটা।

ঠিক আছে।

আমরা সেই গাছবের পা খুলিয়ে বসে রহিলাম। জারুল চৌধুরী তার লাল গামছায় চশমা পরিষ্কার করে একটা নিষ্পত্তি ফেলে বললেন, করদিনেই জ্যোগাটার উপর মাঝা পড়ে গেছে।

ইঝা, এত সুন্দর গাছপালা ! নিরিবিলি।

ছেড়ে বেতে কষ্ট হবে।

আমি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি ছেড়ে যাবেন ?

ইঝা। যেতে তো হবেই এক সময়ে।

তাহলে এত সুন্দর করে এই যে দুর তৈরি করলেন ?

শুধু হয়েছে, তাই তৈরি করছি। এক সময়ে ছেড়ে যেতে হবে। সংসারে কিছু কি যাখা যাব ? সব ছেড়ে যেতে হয়।

শুনে আমাদের একটু মন খারাপ হয়ে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেোথাও যাবেন আপনি ?

ঢাকা। এ জ্যোগাটা আসলে বিক্রি করে দিচ্ছি। কেউ থাকে না, কোন কাজে আসে না।

সলীল আপ্তে আপ্তে বলল, সব কিছু কি কাজে আসতে হয় ?

জারুল চৌধুরী কেমন দেন অবাক হয়ে সলীলের দিকে তাকালেন, তারপর আবার চশমা খুলে মনোযোগ দিয়ে তার লাল গামছা দিয়ে চশমার কাঁচ পরিষ্কার করতে লাগলেন।

সলীল জিজ্ঞেস করল, যে জ্যোগাটা কিনছে সে কি করবে এখানে ?

ইটের ভাটা তৈরি করবে।

ইটের ভাটা ? আমি আর সলীল প্রায় চিন্কার করে বললাম, ইটের ভাটা ?

ইঝা। কাছেই নদী, নৌকায় ইট আনা নেয়া করা খুব সহজ হবে। জঙ্গলে গাছপালা আছে, কেটে লাকড়ি তৈরি করা হবে।

লাকড়ি ?

জারুল চৌধুরী কেমন দেন অপরাধীর মত মুখ করে আমাদের দিকে তাকালেন। আমি যাথা নেড়ে বললাম, এটা যদি আমার জ্যোগা হত তাহলে কখনো এই জ্যোগা আমি বিক্রি করতাম না। কখনো না।

সলীলও আপ্তে আপ্তে বলল, আমিও করতাম না।

জারুল চৌধুরী কেমন দেন কাছমাছু করে বসে বইলেন, দেখে মনে হল, তার কেমন জানি মন খারাপ হয়ে গেছে। মনে হল কিছু একটা চিন্তা করছেন। সলীল আবার বলল, আপনি জিঞ্চা করতে পারেন, এই সুন্দর জ্যোগাটা একটা ইটের ভাটা হয়ে যাবে ? সব গাছ কেটে ফেলবে, শুকনো ধু ধু চারিদিকে, যাবাবানে ইটের ভাটা। সেখান থেকে ধোয়া বের হচ্ছে। কাল বৃচ্ছুটে ধোয়া—

জারুল চৌধুরী মনে হল আরো দমে গোলেন। আনিকক্ষণ পা খুলিয়ে বসে থেকে বললেন, তোমরা মনে হয় ঠিকই বলেছ। কিন্তু যুশকিলটা কি জান ?

কি ?

বড় হয়ে গেছি। যেটা করতে চাই সেটা আব করতে পারি না। কি করি জান ? যেটা করা দরকার সেটা।

আমরা তিনজনই মন খারাপ করে একটা বড় গাছের উপর থেকে পা খুলিয়ে বনে রহিলাম।

৬. নাওয়াজ খান

গ্রীন মেডিকেল মিলিকের সামনে এসে আমি আর সলীল দুঃখনেই দাঢ়িয়ে দেলাম। সলীল এতক্ষণ বেশ বড় বড় কথা বলছিল, কেমন করে নাওয়াজ খানের সাথে দেশের উন্নতি নিয়ে কথা বলবে, মানুষের দৃঢ়ত্ব-কষ্ট কেমন করে দূর করা যাব সেসব আলোচনা করবে, কিন্তু শেব মুহূর্তে তার উৎসাহ কেমন যেন যিইয়ে গেল। আমি বললাম, চল ফিরে যাই। খাবাখা গিয়ে কি হবে ? বড় মানুষ, উল্টো একটা ধরক দিয়ে বের করে দেবে।

কেন ধরক দিয়ে বের করে দেবে ?

বড় মানুষদের আকেল কম হয়, সেজন্য।

সলীল আমার দিকে চোখ পালিয়ে তাকিয়ে বলল, তোর ধরণা বড় মানুষ মাত্রই

খারাপ, সেটা ঠিক না। পৃথিবীতে অনেক ভাল বড় মানুষ আছে। যদি একজন ভাল মানুষ থাকে তার দেখাদেখি আরো অনেক ভাল মানুষ বের হয়।

কচু হয়।

সলীল রেঘে বলল, ধরে একটা খাবড়া দেব। কবি রবিশ্রীনাথ শাস্ত্রিনিকেতন তৈরি করেছিলেন, কত বড় বড় মানুষ যেখান থেকে বের হয়েছে জানিস?

আমি সলীলকে রাগানোর জন্যে হি হি করে হেসে বললাম, তুই ভাবছিলি নাওয়াজ খানকে নিয়ে আরেকটা শাস্ত্রিনিকেতন তৈরি করবি?

সলীল কিছু না বলে আমার দিকে চোখ লাল করে তাকিয়ে গ্রীন মেডিকেল ক্লিনিকের সামনে দুইবার সামনে পিছনে ইটল। তারপর আমার মুখের কাছে আঙুল তুলে বলল, তোর যা ইচ্ছা হয় কর, আমি ভিতরে গেলাম।

তারপর আমি কিছু কলার আগে সত্ত্ব সত্ত্ব গেটি খুলে ভিতরে ঢুকে গেল। আমি একা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি কেমন করে, তাই সলীলের পিছনে আমিও ঢুকে গেলাম। গেটের পিছনে রাস্তায় একটা সাদা রঙের মাইক্রোবাস। একজন মানুষ লাল রঙের একটা কাপড় দিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে গাড়িটা মুছে পরিষ্কার করছে। মনে হয় মানুষটা ডাঙুর নাওয়াজ খানের ড্রাইভার। মানুষটা আমাদের দেখে ভুক্ত কুঁচকে খামার্খাই গলা উঠিয়ে বলল, কি চাও?

সলীল কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, আমরা ডেক্টর নাওয়াজ খানের সাথে দেখা করতে এসেছি।

লোকটা এক পা এগিয়ে এসে বলল, কেন?

তার সাথে একটু কাজ ছিল।

কি কাজ? চাঁদা চাইতে এসেছ? ডাঙুর সাহেব কোন চাঁদা-ফাঁদা দেন না।

না, চাঁদা না। তার সাথে একটু কথা বলতে চাই।

কি কথা?

সলীল মনে হয় তখন একটু রেঘে গেল। বলল, সেটা আমি নাওয়াজ খান সাহেবকে বলব।

সলীলের কথা শুনে ড্রাইভার মানুষটাও মনে হল রেঘে গেল। বলল, ডাঙুর সাহেব ব্যাপ্ত মানুষ, তোমাদের সাথে খোল্পগল্প করার সময় নাই। যাও, বাড়ি যাও।

সলীলও খুব রেঘে গেল, কিন্তু তবু সে গলার স্বর টাঁও রেঘে বলল, আপনি কে? আপনার কথায় কেন আমরা যাব? আমরা ডেক্টর নাওয়াজ খানের সাথে কথা বলতে এসেছি, তার সাথে কথা না বলে থাব না।

ড্রাইভার মানুষটা এবাবে রেঘে আগুন হয়ে কিছু একটা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ দোতলা থেকে একটা মানুষের গলা কুনতে পেলাম, ওসমান!

আমরা উপরে তাকালাম, দোতলার বারান্দায় ফর্সা লম্বা একজন সূপরি মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। নিচরই ডাঙুর নাওয়াজ খান। সেখান থেকেই আবার বলল, কি

হয়েছে ওসমান?

ওসমান নামের মানুষটা একটু দ্রুতমত খেয়ে বলল, এই দূজন ছেলে আপনার সাথে দেখা করতে চায়।

কেন?

আমাকে কলবে না।

ঠিক আছে। উপরে পাঠিয়ে দাও।

সলীল আর আমি ওসমানের দিকে বিজীর হত তাকিয়ে সিডি দিয়ে উপরে উঠে গেলাম। মানুষটা খুব রেঘেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ উপরে উঠতে উঠতে আমরা দেখলাম, ওসমান সাইক্লোবাসের টায়ারে প্রচণ্ড ঝোরে একটা লাবি মেরে বসল।

ওপরে সিডির পাশে একটা ছোট ঘর, ডাঙুরের চেম্পারের ঘর। একটা বড় টেবিল, পিছনে শেলফ, শেলফে ডাঙুরী বইপত্র। টেবিলের এক পাশে একটা চেম্পারে নাওয়াজ খান বসে আছেন। আমাদের ঢুকতে দেখে খুব তুল বিজ্ঞেস করলেন, তোমরা আমার সাথে দেখা করতে এসেছ?

সলীল আর আমি এক সাথে মাথা নাড়লাম। নাওয়াজ খানের গলার স্বর গুরু গুরুর, শুনে কেমন হেল ভয় লেগে যায়।

কি ব্যাপার?

সলীল কেশে একটু গলা পরিষ্কার করে বলল, আমার নাম সলীল। আর এই হচ্ছে মুরীর।

ও।

আমরা গভর্নেন্ট স্কুলে পড়ি।

বেশ।

আমরা আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি কয়েকটা প্রশ্ন করার জন্যে।

কি প্রশ্ন?

সলীল হঠাৎ একটু ঘাবড়ে গেল। নাওয়াজ খানের গলা রীতিমত কঠিন, এবংক্ষম মানুষের সাথে স্বাভাবিক কথাবার্তাই চালানো যায় না, তাকে কঠিন কঠিন প্রশ্ন করা তো এক বৃক্ষ অসম্ভব। সলীল তবু চেষ্টা করল, মাথা চুলকে গলা থাকারী দিয়ে ঠিক কিভাবে শুরু করবে বুঝতে না পেরে আমতা আমতা করে বলল, দেশের মানুষের উন্নতির জন্যে আমাদের কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

নাওয়াজ খান কোন কথা না বলে সরু চোখে সলীলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাকে দেখে মনে হয়ে লাগল তিনি কেমন হেল রেঘে উঠছেন। আমাদের হঠাৎ কেমন জানি ভয় করতে থাকে, সলীল আরো একটা কি বলতে দিয়ে হঠাৎ দ্রুতমত খেয়ে থেঘে যায়। নাওয়াজ খান থমথমে গলায় বললেন, তুমি এটা বিজ্ঞেস করার জন্যে আমার সাথে দেখা করতে এসেছ?

সলীল দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল।

নাওয়াজ খান মুখ ধাকা করে চিটকিরি করার মত ভঙ্গি করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি? কি প্রশ্ন?

এত মানুষ থাকতে তোমরা আমার কাছে এসেছ কেন? তোমাদের আসল উদ্দেশ্যটা কি?

সলীল আগতা আমতা করে বলল, আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য নাই। আমাদের এটা তো ছেট শহর, বড় মানুষজন বেশি নাই। বড় ভাঙ্গার ইঞ্জিনিয়ার প্রফেসর নাই। আপনি যখন এখানে এসে এত বড় যেভিকেল ট্রিনিং খুলছেন আপনার নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে—

নাওয়াজ খান টেবিলের উপর ঝুকে প্রায় ঘাসের মত গর্জন করে বললেন, আমার উদ্দেশ্য আছে?

সলীল দুই হাত উপরে তুলে বলল, না না না, খারাপ উদ্দেশ্য না! ভাল উদ্দেশ্য। নিশ্চয়ই ভাল উদ্দেশ্য।

নাওয়াজ খান কোন কথা না বলে আমাদের দিকে ঢোক ছেট করে তাকিয়ে রইলেন। সলীলের কথাবার্তা খুব যে ভাল এগুচ্ছ না তাতে কোন সন্দেহ নেই, সেটা ভাল এগুবে তার কোন সন্তানবানাও নেই। আমি এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম, এবারে টি টি করে বললাম, আপনি যদি খুব ব্যস্ত থাকেন তাহলে আমরা এখন যাই। অন্য কোনদিন না হয় আসব।

নাওয়াজ খান ধূমক দিয়ে বললেন, সত্যি করে বল কেন এসেছ?

খোদার কসম, আমি বুকে হাত দিয়ে বললাম, আমরা এমনি এসেছি। তোমরা যে এখানে এসেছ তার পিছনে আর কোন কারণ নেই? জী না, নেই।

সলীলও জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, না স্যার, কোন কারণ নেই। আমাদের স্কুলে এটা নিয়ে একটা রচনা লিখতে হবে, তাই ভাবলাম, যারা বড় মানুষ, দায়িত্বশীল মানুষ, তাদের সাথে কথা বলে দেখি। আমরা ছেট বলে কেউ বেশি পাত্র দিতে চায় না, তাই ভাবলাম—

কি ভাবলে?

আপনার সাথে কথা বলে দেবি।

আগে আরো ঢেটা করেছ?

করেছি। কেউ পাত্র দেয় নাই। সলীল অত্যন্ত সরল মুখ করে মিথ্যা বলতে থাকে, কলেজের প্রিলিপালের কাছে গিয়েছি, চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে গিয়েছি। আরো দুইজন ভাঙ্গারের কাছে গিয়েছি।

নাওয়াজ খান মনে হল শেষ পর্যন্ত একটু নরম হলেন। বললেন, টিক আছে, বন।

আমরা দুইজন খুব সাবধানে একটা নিঃশ্঵াস বের করে দিয়ে কাছাকাছি দুইটা চেয়ারে বসলাম। নিজেদেরকে মনে হচ্ছে ফাসির আসামী, যেন এক্সুনি ফাসির রায় দেয়া হবে।

নাওয়াজ খান চেয়ারে নড়েচড়ে বসে বললেন, তোমাদের প্রশ্নটা যেন কি?

দেশের উন্নতির জন্যে আমাদের কি করা উচিত?

প্রত্যেকটা মানুষ যদি নিজের উন্নতি করে তাহলেই দেশের উন্নতি হবে।

কিন্তু, কিন্তু—

কিন্তু কি?

একজন যদি খুব গরিব হয়, পড়াশোনা করতে না পারে, কোন সুযোগ না পায়, তাহলে সে নিজের উন্নতি কেমন করে করবে?

সেরকম মানুষৰ কথা ভুলে যাও।

ভুলে যাব?

হ্যাঁ। তারা সমাজের বোৰা। দেশের বোৰা।

বোৰা?

হ্যাঁ। সেরকম মানুষ যত কম হয় তত সঙ্গ।

কিন্তু—

নাওয়াজ খান জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অন্যবন্দিষ্কের মত বললেন, পৃথিবীজ হচ্ছে একটা বিবাট ফুড চেইন। একদল আরেক দলকে থাক্কে। খেয়ে বেঁচে আছ। যার কপাল ভাল সে ফুড চেইনের উপরে, যার খারাপ সে নিচে। ঢেটা করতে হয় ফুড চেইনের উপরে থাকতে যেন তোমাকে কেউ খেতে না পাবে, কিন্তু তুমি অন্যকে খেতে পাব।

নাওয়াজ খান কি বলতে চাইছেন আমি আর সলীল টিক বুকতে না পেরে একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম। নাওয়াজ খান জানালার বাইরে যেকে মুখ ঘূরিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, যারা গরিব, অশিক্ষিত, মূর্খ মানুষ তারা দুর্বল মানুষ। তারা ফুড চেইনের নিচে। তারা কোন কাজে আসে না। যদি কোনভাবে তাদের ব্যবহার করা যায়, ভাল। করা না গেলে নেই। তাদের নিয়ে মাথা ঘায়ালে দেশের কোন উন্নতি হবে না। দেশের উন্নতি করবে সমাজের যারা এলিট গ্রুপ, তারা। যারা জ্ঞান-গুণে, বিদ্যায়-বৃদ্ধিতে তুঁধোড়, তারা। ঢেটা কর সেরকম মানুষ হতে—

সলীল প্রতিবাদ করে আরো কি একটা বলতে দিয়ে দেয়ে গেল, এই যানুষটার সাথে কথা বলে কোন লাভ নেই। নাওয়াজ খান আমাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আর কোন প্রশ্ন আছে?

আমরা মাথা নাড়লাম, না নেই।

যাও, তাহলে বাড়ি যাও।

গ্রীন মেডিকেল ক্লিনিক থেকে হেটে আসতে আসতে সলীল বলল, নাওয়াজ খান
মানুষটা অনেক ডেঙ্গুরাস।

আমি বলেছিলাম না তোকে ?

চোখের দিকে তাকালে কেমন ফেন গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে !

আমি আবার বললাম, তোকে বলেছিলাম না আগেই ?

তোম অয়নালের মনে হয় আসতে বড় বিপদ হতে পারে। বলিস এই লোক থেকে
দূরে থাকতে। এক্ষে হাত দূরে থাকতে।

পারভেজ স্যারের রচনা লিখতে আবাদের একটু বামেলা হল। অনেক চিঞ্চা-
তাবনা করে আমি লিখলাম বৃদ্ধাবনের উপর, যে উকিল সাহেবের গঙ্গার দূধ দোয়াতে
আসে। শুরুর শুরু কিন্তু এই বয়সে সে আসার একটা বাচাকে নিজের বাচার ঘত
করে বড় করেছে। সব সময় তার শিছনে শিছনে ঘুরে। সলীল লিখল একজন
রিকশাওয়ালার উপরে, ভুল করে একবার রিকশার একটা ব্যাগ ফেলে যেখে এসেছিল,
রিকশাওয়ালা খুঁজে এসে ফেরৎ দিয়ে গেছে। ব্যাগে বেশ কিছু টাকা ছিল কিন্তু সে
খুলেও দেখেনি !

৭. আহসান এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড

ইতিহাস ক্লাসে সুনির্মল দশ্মুরী একটা ছেট চিয়বুট নিয়ে এল। ইতিহাস স্যার চিরকৃটা
পড়ে দৃঢ় কুঁচকে ক্লাসের দিকে তাকালেন, তারপর দেখ স্বরে বললেন, মূলীর আর
সলীল—

আমি আর সলীল উঠে দাঢ়ালাম।

তোমাদের দুঃসন্তকে হেডস্যার ডেকে পাঠিয়েছেন।

ওনে আবাদের একেবারে আকেল গুরু হয়ে গেল। হেডস্যার ডেকে পাঠানো
এখন পর্যন্ত কারো জনে কোন সুসংবাদ বরে আনেনি। এক কথায় বলা যায়, এটা
সাক্ষাৎ মনুর আলাদত। কি জনে আবাদের উপর এই যথ বিপর্যয় নেমে আসছে
সেটাই শুশ্রা। সেদিনের স্কুল পালানোটা কি হেডস্যার জেনে গেছেন? কিন্তু সেটা
কিভাবে সত্ত্ব? অন্য কেউ তো টের পায়নি। তাহলে কি বড়দের উপন্যাস পড়া? কিন্তু
সেটাও তো খুব বেশি মানুষ জানে না। নাওয়াজ খানের চেম্বারে গিয়ে আমরা কি
কিছু গোলমাল করে এসেছি? নাকি অন্য কিছু? গত কয়েক সপ্তাহে আমি যত অপকর্ম
করে এসেছি সবগুলি একে একে মনে পড়তে লাগল।

ইতিহাস স্যারের কোন দয়া মাঝা নেই বলে ধরে নেয়া হয়। ক্লাসে আবার সেটা

প্রমাণ হল, স্যার মধুর ভঙিতে হেসে বললেন, যাও বাবারা, একটু খোলাই থেয়ে আস।

আমি আর সলীল ফ্যাকাসে মুখে সুনির্মল দশ্মুরীর সাথে ঝগনা দিলাম। সলীল গলা
নাখিয়ে বলল, সুনির্মলা, ব্যাপারটা কি?

সুনির্মলা একটা লম্বা নিশ্চাস ফেলে উদাস গলায় বললেন, আর ব্যাপার!

ওনে আমরা আরো ঘাবড়ে গেলাম।

হেডস্যারের রূপে পর্দা সরিয়ে উঠি যেরে দেবি, ভিতরে দুইজন মানুষ বসে
আছে। দূজনেই মোটা এবং ফর্সা। বড়লোকদের এক রকম চেহারা হয়, তাদের চেহারা
দেরকম। একজনের মাথায় চুল পাতলা হয়ে এসেছে, অন্যজনের বড় বড় গৌফ এবং
চোখে কালো ফেমের চশমা। আমরা ভারি পর্দার ভিতর দিয়ে মাঝ গলিয়ে দুর্বল গলায়
বললাম, স্যার আবাদের ডেকেছেন?

ইয়া, ডেকেছি। এসো। হেডস্যার কথা শেব করে আবাদের দিকে হাসিমুখ
তাকালেন। অবিস্মান ব্যাপার, আমি হেডস্যারকে কখনো হাসতে দেখেছি বলে যদি
করতে পারলাম না। শুধু তাই নয়, স্যারের গলার স্বর মাঝদের ঘত নয়, আবাদের
নিজেদের কানকে বিশ্বাস হল না।

আমরা সাবধানে ভিতরে চুক্লায়, এখনো পুরোপুরি নিশ্চিত না ব্যাপারটা কেন
রকম বসিকৃত কিনা। হেডস্যার ঘিজেস করলেন, তোমরা সলীল আর মূলীর?

ঢী স্যার। আমি মূলীর।

সলীল বলল, আমি সলীল।

হেডস্যার লোক দূজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই যে, যে দূজনকে আপনার
খুজছেন।

লোক দূজন আবাদের দিকে তাকিয়ে রইল, খুব চেষ্টা করছে হাসি হাসি মুখ করে
তাকাতে, কিন্তু কেন জানি আবাদ মনে হল লোক দূজন কোন কারণে আবাদের উপর
গেগে আছে। টাক মাথার মানুষটি মুখের হাসিটাকে আয়ে বড় করে গলার শুধু চেলে
বলল, খোকারা, কেমন আছ?

ভাল।

বেশ। বেশ। বেশ। লোকটা পুতুলের মতো মাঝ নেতৃত্বে আবার বলল, বেশ। বেশ।
বেশ।

দুই নম্বর মানুষটি, যার চোখে চশমা এবং নাকের নিচে বড় বড় গৌফ, মুখে একটা
হাসি ফুটিয়ে বলল, আমরা ঢাকা থেকে এসেছি, বিকেলের ট্রেনে চলে যাব।

আমি আর সলীল দূজনেই লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আবাদের ডেকে
পাঠানোর সাথে বিকেলের ট্রেনে তাদের ঢাকা ফিরে যাবার কি সম্পর্ক এখনো ঠিক
যুক্তে পারলাম না।

টাক মাথার লোকটি বলল, আমরা এখানে এসেছি একটা বিজনেসের ব্যাপারে।

চশমা চোখের লোকটি বলল, আবাদের অনেক রকম বিজনেস। গামেটিস,

শিপিং, প্লাস্টিক, আরো অনেক কিছু।

টাক মাথার লোকটা বলল, আহসান এন্টারপ্রাইজ বললে সবাই এক নামে চেনে। যাই হোক যেটা বনহিলাম, আমরা একটা জমি কিনব প্রফেসর জহরুল চৌধুরীর কাছে থেকে। অংকের প্রফেসর—

টাক মাথার মানুষটি হঠাৎ খুব জোরে জোরে হাসতে শুরু করল, দেন অংকের প্রফেসর হওয়া খুব একটা হসির ব্যাপার। আমি আর সলীল একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম, তখনে বহস্যটার সমাধান হয়নি কিন্তু যোগাযোগটা কিভাবে হয়েছে মনে হয় একটু একটু আদাঙ করেত পারছি।

চশমা চোখের মানুষটি বলল, প্রফেসর সাহেব খুব মজার মানুষ। খুব খেয়ালী মানুষ!

জানী মানুষেরা সাধারণত খেয়ালী হয়। প্রফেসর জি. সি. দেব ছিলেন জানী মানুষ। একবার নাকি ক্লাসে ভূল করে মশারী পরে চলে এসেছিলেন। পাকিস্তান আর্মি মেরে ফেলেছিল সেভেটি ওয়ালে। দেশের একটা বিগ লস। চশমা চোখের মানুষটা জিব দিয়ে চুকচুক করে শব্দ করল,

টাক মাথার মানুষটা পকেট থেকে একটা কাগজ দেব করে ঢেবিলে রাখতে রাখতে বলল, খোকারা, তোমরা বিশ্বাস করবে না, প্রফেসর জহরুল চৌধুরী কি রকম মজার মানুষ শনো। তার কাছ থেকে আমরা, আহসান এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড, একটা জমি কিনছি। আর প্রফেসর সাহেব কি করলেন জান?

কি?

বলছেন একটা কাগজে তোমাদের দুজনের সিগনেচার নিয়ে আসতে। সেহে কাগজে তোমরা লিখে দেবে “এই জমি বিক্রি করিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই।” টাক মাথার মানুষটি আবার দুলে দুলে হাসতে শুরু করল।

চশমা চোখের মানুষটি আঙুল লিয়ে তার বড় বড় পোক টানতে বলল, তোমাদের মনে হয় খুব স্নেহ করেন। গাছের উপরে একটা ঘর তৈরি করছেন, সেখানে নাকি তোমরা গিয়েছ?

আমরা মাথা নাড়লাম।

চশমা চোখের মানুষটি হঠাৎ মৃত্যুকে একজন দাশনিকের মত করে বলল, আসলে যারা বড় মানুষ তারা সব সময় বাকাদের ভালবাসেন। বাকাদের ঘাবে এক ধরনের ইনোসেস থাকে যেটা আমরা টের পাই না। যারা সত্যিকারের বড় মানুষ তারা সেটা চট করে ধরতে পারে।

টাক মাথার মানুষটি আবার পুরুলের মত জোরে জোরে মাথা নাড়ল। চশমা চোখের মানুষটি ঢেবিলের উপরে রাখা কাগজটা আবাদের দিকে এগিয়ে বলল, আমি তোমাদের ঝামেলা কমানোর জন্যে কাগজে টাইপ করে এনেছি — “এই জমি বিক্রি করিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই।” তোমরা নিচে তোমাদের নাম লিখে দাও। কিসে

লিখবে? ইংরেজিতে, না বাংলায়?

সলীল একটু গলা পরিষ্কার করে বলল, কিন্তু আমাদের আপত্তি আছে। জ্যা? যানে হল মানুষটা টিক বুঝতে পারল না সলীল কি বলছে।

আমাদের আপত্তি আছে। এই জায়গাটা বিক্রি করায় আমাদের আপত্তি আছে।

তোমাদের আপত্তি আছে?

হ্যা। আমি আর সলীল মাথা নাড়লাম।

জমিটা কি তোমাদের? তোমার ফ্যারিলিয়ার?

না।

তাহলে তোমার আপত্তি আছে মানে?

তবু আপত্তি আছে। জায়গাটা খুব সুন্দর, স্বচ্ছ ছুটি হলে আমরা সেখানে বেড়াতে যাই। আপনারা জায়গাটা কিনে সেখানে ইটের ভাটা বানাবেন। সব গাছ কেটে ফেলবেন। আমাদের সে জন্য আপত্তি আছে।

লোক দুজন আপ্টে আপ্টে রেগে উঠল। মানুষ রেগে গোলে তাদের খুব খারাপ দেখায়, এই দুজনকেও খুব খারাপ দেখাতে লাগল। আবার টাক মানুষটাকে কেমন মেল মোহের মত দেখাতে লাগল। সে হেঁৰ করে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, এটা মশকরা করার জায়গা না। নাও এখানে সাইন কর।

উহ। লোকটা এবাবে হেডস্যারের দিকে তাকিয়ে বলল, স্যার, একটু বলবেন সাইন করতে।

হেডস্যার এতক্ষণ খুব কৌতুহলী চোখে আমাদের দিকে তাকিয়েছিলেন। লোকটার কথা শুনে বললেন, আমরা বলা তো টিক হবে না। আমি তো এর আগে পিছে কিছুই জানি না। প্রফেসর সাহেব যখন এদের অনুমতি চাইছেন, এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন কাবণ আছে। আমি তাদের পড়াশোনা করতে বলতে পারি, হোমওয়ার্ক করতে বলতে পারি, কিন্তু এটা তো বলতে পারি না।

আমি আর সলীল কৃতজ্ঞ চোখে হেডস্যারের দিকে তাকালাম। কখনো বুঝতে পারিনি স্যার এরকম একটা কথা বলবেন। যানে করেছিলাম, কাগজটাতে সাইন করাব জন্যে এখন একটা ধূমক দেবেন বৈ, আমরা একেবারে কাপড় ভিজিয়ে ফেলে ছুটে নিয়ে সাইন করব।

চশমা চোখের লোকটি তার পোকে টান দিতে দিতে হেডস্যারের দিকে খুকে পড়ে বলল, কিন্তু স্যার, আপনি বুঝতে পারছেন না! অনেক বড় বিজনেস তিন, একজন মানুষের পাগলামির জন্যে তো নষ্ট হতে পারে না।

পাগলামো?

অফকোর্স। প্রফেসর সাহেব বড় পাগল। ঝেলখানার না হয় পাগলা গারদে অটিকে রাখার কথা। বয়স্ক মানুষ, একটা গাছের উপর বসে থাকে, চিন্তা করতে পারেন?

মোটেও পাগল না। আমি গলা উঁচিয়ে বললাম, ভাবুল চৌধুরী মোটেই পাগল না।
অনেক ভালমানুষ।

টাক মাথার মানুষটি হঠাৎ গলা উঁচিয়ে বলল, দেখি, আমি দুজনের সাথে একটু
কথা বলে দেখি। আস খোকারা, আমার কাছে আস। কি হেন নাম জামাল আর কি —
সলীল আর মুনীর।

ও আজ্ঞ। সলীল আর মুনীর। আস, কাছে আস।

আমরা এগিয়ে গেলাম।

বুদ্ধেছ খোকারা, এটা অনেক বড় ব্যাপার। দেশের উরতির অন্যে কলকাতাখনা
তৈরি করতে হয়, বাড়িঘর তৈরি করতে হয়। তার অন্যে ইট লাগে, সিঁড়েট লাগে। ইট
তো আর গাছে থবে না, ইট তৈরি করতে হয়। সে অন্যে ইটের ভাটা খুব জরুরি। আর
তাই আমাদের এই জায়গাটা দরকার। এমনিতে পড়ে আছে, ভাঙ্গা, জরুরী,
সাপঝোপের আজ্ঞা। তোমাদের কি দেখে ভাল লাগল কে জানে। যাই হোক, ভাল
যখন লেগেছে তোমরা এখানে যখন খুশি বেড়তে আসবে। আমি বলে রাখব, যখন খুশি
তোমরা আসতে পারবে।

ইটের ভাটায় ?

মানুষটা না শোনার ভাল করে বলল, তোমরা যদি এই কাগজটায় সাইন করে দাও
তাহলে কি করব জান ?

কি ?

দুইজনকে দুইটা সাইকেল কিনে দেব। নতুন সাইকেল। একেবারে ত্রাণ নিউ। কি
বল, হ্যাঁ ?

নতুন সাইকেল ? আমার বুকের ভিতর একেবারে ছলাং করে উঠে। সলীল অবশ্যি
গঙ্গীর হয়ে মাথা নাড়ল, বলল, সাইকেল চাই না।

তাহলে কি চাও ?

কিছু চাই না।

মানুষ দুজন চোখ দুটি নিয়ে আগুন বের করে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল।
আমরা চোখ সরালাম না, বুক চিতিরে দাঢ়িয়ে রইলাম। খালিকফপ এভাবে ফেটে গেল,
তখন হঠাৎ একজন উঠে দাঢ়িয়ে টেবিলে একটা ধাবা নিয়ে বলল, এই অন্যে সব সময়
বলি পাগল ছাগলের সাথে কথনো বিজনেস করতে হয় না।

অন্যজনও তখন উঠে দাঢ়িল, টেবিল থেকে কাগজটা নিয়ে কুটিকূটি করে ছিড়তে
ছিড়তে বলল, হেলেপিলে ঠিক করে যানুষ হয় না আজকাল। আমাদের সময় শক্ত
শিল্পি দেয়ার নিয়ম ছিল, বেয়াদাৰ ছেলেৱা একেবাবে সিদে হয়ে যেতো।

হেডস্যার হাসি হাসি মুখে বললেন, আমি মার্টাৰ মানুষ, আমিও বেয়াদপি
একেবাবে সহ্য কৰি না। আমার ছেলেৱা আৰ যাই কুকুক কোন বেয়াদবি কৰেলি।

মানুষ দুইজন নাক দিয়ে এক ধরনের শব্দ করতে করতে ঘৰ থেকে বের হয়ে

গেল। হেডস্যার সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাথা নাড়লেন, তাকে দেখে মনে
হতে লাগল হেন খুব যজ্ঞীর একটা জিনিস দেখেছেন।

আমি হেডস্যারের দিকে তাকিয়ে বললাম, যাৰ স্যার আমৰা ?

যাও।

আমৰা বেৰ হয়ে যাচ্ছিলাম, হেড স্যার আবাব জিঙ্গেস কৰলেন, দিনবাত শুধু বন
জংগলে ঘোৱাঘুৰি কৰ, নাকি পড়াশোনাও কৰ ?

পড়াশোনাও কৰি স্যার।

ৰোল নাম্বাৰ কৰ ?

তিনি।

হেডস্যার আবাব দিকে তাকালেন, আমি উদাস উদাস মুখ কৰে বললাম, তেইশ !
তেইশ ? পড়াশোনা কৰলে ৰোল নাম্বাৰ তেইশ হয় কেমন কৰে ?

আমি কিছু বললাম না, বলাৰ কিছু ছিলও না। হেডস্যার বললেন, যাও ক্লাসে যাও।

আমৰা বেৰ হয়ে যাচ্ছিলাম, হেডস্যার আবাব আমাদেৱ আমালেন, যে আমগাটা
নিয়ে এত হৈ তৈ সেটা কি আসলৈ সুন্দৰ ?

ঝী স্যার। অপূৰ্ব সুন্দৰ জায়গা। সলীল হ্যাত নেড়ে বলল, আপনি দেখলে মুঠ হয়ে
যাবেন।

একবাৰ নিয়ে যেও তো আমাকে।

নিয়ে যাৰ স্যার। আপনি কলালে আমৰা নিয়ে যাৰ। আপানাৰ যখন ইছে।

আৰ ঐ প্ৰফেসৱ সাহেব, সতীই কি গাছেৰ উপৰ থাকেন ?

সৰ সমষ্টি না স্যার, মাঝে মাঝে। গাছেৰ উপৰ চমৎকাৰ ঘৰ স্যার, থাকতে কোন
অসুবিধে নেই।

ও, আজ্ঞ। ঠিক আছে তোমৰা যাও।

আমৰা বাইবে যেতে যেতে দেখলাম, হেড স্যার আনালা দিয়ে বাইবে তাকিয়ে
আছেন। বাইবে দুটি বড় বড় পাছ, স্যার সেই গাছেৰ দিকে কেমন জানি একৰকম হুৰ
কৰে তাকিয়ে আছেন। কে জানে স্যাবেৰ হয়তো ছেলেকেলাৰ কথা মনে পড়েছে !

৮. শুষ্ক ফ্যান্টেরি

বাসাৰ এসে দেখি বাইবে লুঁজি খুলছে এবং ভিতৰ থেকে বাবাৰ জিব পৰিষ্কাৰ
কৰাৰ বিকট শব্দ বেৰ হচ্ছে। পা টিপে টিপে ভিতৰে দুকে দেখলাম, রাম্বাঘৰে যা
কীধেছেন এবং রাম্বাঘৰেৰ দৱজাৰ পিছনে লাবলু দাঢ়িয়ে ফৌসকোৰ্স কৰে কীদেছে। আমি
টেবিলেৰ উপৰ বইগুলি খেৰে বারাদাৰ এসে দাঢ়ালাম। শিউলি গাছটা বেশ বড়োসোৱা
হয়েছে। নিচে আৰ কোন ডাল নেই, বাবা আজ কোন ডালটা ভাঙবেন কে জানে। আমি

বারান্দায় দাঢ়িয়ে একটা লম্বা নিশ্চাস ফেললাম। সলীলের সাথে বাসা থেকে পালিয়েই যেতে হবে, এভাবে আর থাকা যাব না।

সে রাত্রে খুব একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটল, বাবা আমাদের যারলেন না। মারতে চাননি সেটা অবিশ্য সত্য নয়, কিন্তু ঠিক সময় করে উঠতে পারলেন না। যগরবের নায়াজ পড়েই বাবা টেবিলের ওপর কয়েকটা খবরের কাগজ বিছিয়ে কি একটা কাজ শুরু করে দিলেন। টেবিলের ওপর শিলি বোতল প্যাকেট রাখতে রাখতে বাবা আমাকে আব লাবলুকে খুব খারাপ খারাপ কথা বলে গালি দিতে লাগলেন। আমাকে বললেন শুধরের বাচ্চা, বদমাইশ, জানোয়ার এবং হারামখোর। লাবলুকে বললেন কৃত্তার বাচ্চা, ইবলিশ, বেতমিজ এবং ভূতাচোর। হ্যাচকা টান মেরে আমার কান ছিঁড়ে ফেলবেন এবং চড় মেরে লাবলুর সবগুলি দাঁত ফেলে দেবেন বলে হয়কি দিতে লাগলেন। গালিগালাজ এবং এরকম হস্তিপিণ্ডিকে আমি অবিশ্য বেশি ভয় পাই না। সত্যিকার পিছুরী হলে অন্য কথা।

যে কাজটা করার জন্যে বাবা আমাদের যারতে পর্যন্ত সময় পাচ্ছেন না সেটা কি আমার খুব জানার কৌতুহল হচ্ছিল। বাবা সেটা লুকানোর টেটাও করলেন না, কাজেই আমরা সবাই দেখলাম। প্রত্যেকবার বাবা অফিস থেকে ওষুধ চুরি করে আনেন। এবারে শুধু ওষুধ নয়, ওষুধের সাথে অনেকগুলি ওষুধের খালি বাল্ক আর শিলি এনেছেন। সাথে আরেকটা টোকা ভর্তি ক্যাপসুল। ক্যাপসুলগুলি খালি। ক্যাপসুল যে খালি হতে পারে এবং সেটাকে টেনে খুলে ফেলা যায় আমি জানতাম না। বাবা সেই ক্যাপসুলগুলি খুলে ভিতরে একটু যাদা ভরে দেওয়া আবার বন্ধ করে রাখতে লাগলেন। তারপর ওষুধের শিলির মাঝে শুনেগুনে কুড়িটা করে ক্যাপসুল রেখে মুখ্যটা বন্ধ করে বাস্তুর মধ্যে রাখতে শুরু করলেন। একেবারে নির্ভুল কাজ, দেখে আমাদের তাক গেগে গেল। বাবার মুখ গম্ভীর দেখে মনে হয় সাংঘাতিক একটা জরুরি কাজ করছেন।

যা এসে একবার জিজেস করলেন, কি করছেন?

বাবা মুখ পিচিয়ে প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে বললেন, চোখের মাথা খেয়েছ? দেখছ না একটা কাজ করছি, তার মাঝখানে এসে কথা বল। আরেকল নাই তোমার?

বাবার ধমক থেঁচে যা ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি সরে গেলেন।

ঘন্টা দুয়োকের মাঝে বাবা সবগুলি ওষুধ তৈরি করে তাঁর বাজারের ব্যাগের মধ্যে ভরে বের হয়ে গেলেন। লাবলু তখনো বিশ্বাস করতে পারছিল না যে আজ আমরা মার যাইনি। দাঁত বের করে হেসে ফলল, বাবা মারেন নাই আঘকে।

আমি বললাম, না।

কেন মারেন নাই?

সময় পান নাই। মনে হয় কালকে তাবল মার হবে।

কালকেরটা কাল, লাবলুকে সেটা নিয়ে খুব চিহ্নিত দেখা গেল না। হাসি হাসি মুখে বলল, কেন সময় পান নাই?

দেবিস নাই, ওষুধের ফ্যাট্টোরী খুলেছেন বাসায়।

লাবলু চোখ বড় বড় করে বলল, কেমন করে ওষুধ বানাতে হয় বাবা জানেন?

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, তুই একটা আস্ত গাধা।

লাবলু চোখ পাকিয়ে বলল, খবরদার, আমাকে গাধা কলবে না।

বাবা কি করেছে তুই দেবিসনি?

কি করেছে?

বসে বসে ভেঙাল ওষুধ তৈরি করেছে, তারপর সেই ওষুধ নিয়ে গেছে বিক্রি করার ভাণ্যে।

ভেঙাল ওষুধ?

হ্যাঁ। দেবিসনি, ক্যাপসুলগুলি খুলে তার মাঝে যাদা ঢুকিয়েছে। দেবিসনি?

লাবলু বোকার ঘন্ট মাথা নাড়ল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ভেঙাল ওষুধ খেলে কি হচ্ছে?

অসুখ ভাল হয় না। অসুখ যদি বেশি হয় তাহলে মানুষ মরে যায়।

মরে যায়? লাবলুর মুখ কেফল জালি ফ্যাকাসে হয়ে গেল, সত্য মরে যায়?

এত অবাক হচ্ছিস কেন? মানুষ অসুখ হয়ে মরেছে তুই কোনদিন শুনিসনি?

লাবলু মাথা নাড়ল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জোক গিলে বলল, বাবা মানুষকে মেরে ফেলবে?

মারতেও তো পারে।

সত্যি?

আমি রেখে বললাম, খেতেরী ছাই! তৎ করিস না। দেখছিস না, আমাদের দুইজনকে পিটিয়ে মেরে ফেলবে কোনদিন।

লাবলু আর কোন কথা বলল না, কেমন জানি মনমরা হয়ে বসে রইল।

পরদিন স্কুল ছুটির পর আমি আর সলীল ভাকুল চৌধুরীর সাথে দেখা করতে গুলা দিলাম। আমাদের কথা শনে এত সুন্দর জাহাগাজি বিক্রি করেন নাই, আমাদের গিয়ে অস্ততও তাকে সেজন্যে কিঞ্চ একটা বলে আসা দরকার।

দুজনে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি, তার মাঝে আমি জিজেস করলাম, আজ সলীল, তোকে একটা জিনিস জিজেস করি।

কি জিনিস?

যদি তুই দেবিস একটা মানুষ এমন একটা কাজ করছে যেটা খুব খারাপ —

সলীল আমাকে খামিয়ে দিয়ে জিজেস করল, কত খারাপ?

খুব খারাপ।

কত খুব খারাপ?

এত খারাপ যে—আমি একটু ইতঃত করে বলেই ফেললাম, এত খারাপ য সে

জন্যে মানুষ মারা যেতে পারে।

সলীল রাজায় দীড়িয়ে পড়ে বলল, সক্ষেত্রাম !

যদি তাই দেখিস তাহলে তুই কি করবি ?

আমি সেই মানুষকে সেই কাজ করতে দিব না। কিছুতেই না।

কিন্তু তুই যদি সেই মানুষকে খুব ভয় পাস ?

কত ভয় ?

খুব বেশি ভয়।

কত খুব বেশি ?

এত খুব বেশি যে তাকে দেখলে তোর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। যে যখন খুলি
তোকে ঘারতে পারে। যে এমন যার মাঝে যে—

সলীল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, তোর বাবা ? মিষ্টার স্যাডিস্ট ?

আমি অত্যন্ত খেয়ে বললাম, সেটা আমি বলব না। কিন্তু যদি সেরকম একজন
মানুষ হয় এরকম খারাপ কাজ করে তাহলে তুই কি করবি ?

সলীল অনেকক্ষণ তার মাথা চুলকল। আকাশের দিকে তাকাল, মাটির দিকে
তাকাল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, তাহলে আমি কি করব আমি
জানি না। কঠিন সমস্যা। অনেক কঠিন সমস্যা।

আমি আপ সলীল কেন কথা না বলে রাজ্ঞি ধরে হাঁটতে থাকলাম। ছেট মানুষের
বড় সমস্যা খুব সহজ জিনিস নয়।

জারুল চৌধুরীর বাসায় গিয়ে দেখি তাঁর গাছবরটা যেটাখুটি শেষ হচ্ছে।
গাছবরটা যেইখুব সূন্দর হবে ভেবেছিলাম তার খেকে অনেক বেশি সূন্দর। উপরে ছাপ
দেয়া হয়েছে, এক পাশে বড় জানালা। সামনে ছেট বারান্দা, সেখানে পা খুলিয়ে বসে
বসে জারুল চৌধুরী একটা ইংরেজি বই পড়ছেন। আমাদের দেখে একগাল হেসে
বললেন, আরে ! মানিকজঙ্গড় সেবি ! কি করব তোমাদের ?

আমার হেসে বললাম, আমাদের স্কুলে মুজল মানুষ গিয়েছিল। মুজলেই যোঁ
আর ফরসা। একজনের মাথায় টাক, আরেকজনের চোখে চশমা। একজন—

জানি ! জানি ! আরুল চৌধুরী মাথা নেড়ে বললেন, আরেক মানিকজঙ্গড়। আমি
পাঠিয়েছিলাম, ফিরে এসে সে কি রাগারাগি ! যখন উল্টাপাল্টা কথা বলতে শুরু করল,
থমক দিয়ে বের করে দিলাম।

কি উল্টাপাল্টা কথা বলেছে ?

আজেবাজে কথা। আমাকে নাকি লোক লাগিয়ে খুন করে ফেলবে ! জারুল
চৌধুরী হ্য হ্য করে হাসলেন যেন খুব যজ্ঞীর ব্যাপার হয়েছে একটা।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, সত্তি সত্তি যদি খুন করে ফেলে ?

আরে খুব ! মানুষ খুন করা এত সোজা নাকি ? রাজাকার বাহিনী, বন্দর বাহিনী

আমাকে খুন করতে পারে নাই, আর সেদিনের দুই পুঁচকে ছেটা আগাকে খুন করবে !
মাথা খারাপ নাকি তোমাদের ?

আমরা গাছবরে বসে বসে জারুল চৌধুরীর সাথে বেশ অনেকক্ষণ কথা বললাম।
খুব যজ্ঞ করে গল্প করেন জারুল চৌধুরী আর সবচেয়ে যেটা কোথে পড়ির মত সেটা
হচ্ছে, আমাদের সাথে এমনভাবে কথা বলেন যেন আমরা ছেট না, তাঁর মতই বড়
মানুষ। গাছবরটা শেষ করে এখন একটা নৌকা ফিল্বেন ঠিক করেছেন। সেই নৌকায়
করে নাকি নৌকা ব্রহ্মে বের হবেন। নৌকায় খাবা, নৌকার খাওয়া। রাত্রিবেলা
হারিক্যান ঝালিয়ে বই পড়বেন। শুনে আমাদের এমন লোভ লাগল যে বলার নয়।

জারুল চৌধুরী বললেন আমরা যখন খুলি তাঁর গাছবরে আসতে পারি। এমনিতে
গাছবরে তালা দেয়া থাকবে। নিচে গাছের ফোকড়ে একটা ছেট প্লাস্টিকের কোটির
চাবিটা রাখবেন। গাছবরে শুকনো খাবার, পড়ার বই, ট্রিপিং ব্যাগ, মোবাইল সব কিছু
রাখ থাকবে। আমরা যদি চাই কোনদিন রাতেও এসে থাকতে পারি।

জারুল চৌধুরীর সাথে বসন কথা বলছিলাম তখন হঠাতে সলীল আমাকে কনুই
দিয়ে যোঁ দিয়ে ফিসফিস করে বলল, জারুল স্যারকে বলবি ?

কি ?

তোর সেই কঠিন সমস্যাটা ?

আমি প্রথমে মাথা নেড়ে বললাম, না না না—

কেন না ?

আমার লজ্জা করছিল এবং সেটা বলতেও আমার লজ্জা করল। সলীল তখন
আবার যোঁ দিয়ে বলল, বল না।

আমি খনিকক্ষণ চুপ করে খেকে ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখলাম। আসলেই
ব্যাপারটা খারাপ হয় না। জারুল চৌধুরী মনে হচ্ছে বলতে পারবেন কি করা দয়। আমি
একটু ইতঃতত্ত্ব করে সমস্যাটা খুলে বললাম, মানুষটা যে খবা সেটা আর বললাম না,
কিন্তু মনে হল তিনি বুঝে গেলেন।

আমার কথা শুনে তিনি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপর একটা লম্বা
নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমার শুনে খুব খারাপ লাগল মূলীর যে কুমি এত ছেট মানুষ
কিন্তু তোমার এত বড় সমস্যা। কিন্তু মূলীর, জেনে রাখ, তুমি একা না। তোমার মত
অনেকে আছে। আমি যখন ছেট ছিলাম তখন আমারও একই সমস্যা ছিল। বড় বড়
মানুষ ছিল যাদেরকে লোকজন সম্মান করত কিন্তু আমি জানতাম তারা কত বড়
বদমাইশ। আমি ছেট ছিলাম, তাই ভান করতাম কিছু বুঝি না, কিন্তু আসলে সবই
বুঝতাম। তোমাদের এরকম হয় না ?

আমরা মাথা নাড়লাম।

তোমাদের শুধু একটা জিনিস বলে রাখি। তোমরা যেটা সত্তি জান কখনো সেটা
খেকে বিশ্বাস হ্যাবে না। বড় মানুষেরা বদমাইশ হয় হ্যেক, তোমরা কখনো বদমাইশ

হবে না। কড় যানুবেদা যে কাজ করে তার সব কাজ ভাল সেটা সত্য না।

আমরা আবার যাথা নাড়লাম।

আর মূনীর, তোমার দে সমস্যা সেটা খুব সহজ সমস্যা না। অনেক কঠিন সমস্যা। এটা সমাধান করতে হবে বুদ্ধি থাচিয়ে। তোমরাও ভাব, আধি ও ভাবি। নিচ্ছই একটা বুদ্ধি বের হবে। যদি কোন বুদ্ধি বের করতে পার আগে আমাকে জানিও। তারপর দেখি কি করা যায়। কি বল?

আমি আর সলীল আবার যাথা নাড়লাম।

বাসায় আসার সময় আমি গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকলাম। সত্য কথা বলতে কি, বাসায় আসতে আসতে বেশ করেকটা বুদ্ধি বের হয়ে গেল।

৯. খুন

বিকাল বেলা বাসা থেকে বের হচ্ছি, দেখি, সিডিতে জয়নাল বসে আছে। জয়নাল হাসিখুশি মানুষ, কোন সময় দন খারাপ করে থাকে না। যখন তার হাসিখুশি হওয়ার কোন কারণ নেই তখনো সে হাসিখুশি। আছকে কিন্তু জয়নালকে দেখে মনে হল তার মন খারাপ। গালে হাত দিয়ে বসে আছে। আমাকে দেখেও কিছু বলল না। আমি কাছে গিয়ে বললাম, কি রে জয়নাল!

তবু সে উত্তর দিল না। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, কি রে জয়নাল? কি হয়েছে?

জয়নাল আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার রশীদের কথা মনে আছে?

রশীদ? আমি মনে করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মনে করতে পারলাম না।

জে। রশীদ। যিনির কাজ করত। একদিন নদীর ঘাটে নতুন কাপড় পরে এসেছিল। তখন আমি—

হ্যাঁ হ্যাঁ, যে তোকে ফিরিশতার মত ডাঙ্ডার নাওয়াজের খোজ দিয়েছে?

জয়নাল চমকে উঠে ঠোটে আঙুল দিয়ে বলল, শ স স স আস্তে। কেউ শুনবে।

কে শুনবে? কেউ নাই এখানে। কি হয়েছে রশীদের?

মনে গেছে।

মনে গেছে? আমি চমকে উঠে বললাম, মনে গেছে?

জে।

কেমন করে মনে গেল?

পানিতে ঝুঁবে।

পানিতে ঝুঁবে? আমি অবাক হয়ে বললাম, সাতার জানত না?

জয়নাল একটু হাসার মত ভঙ্গি করে বলল, কি বলেন আপনি মুনীর ভাই! পানির

পোকা ছিল একেবারে। মাছের মত সাতার দিত।

তাহলে তুবে গেল কেন?

জয়নাল কিছুক্ষণ চূপ করে থেকে বলল, আমার কি মনে হয় জানেন? কি?

কেউ একজন মেঝে পানিতে ফেলে দিয়েছে। লুঙ্গির খুটি দিয়ে চোখ মুছে জয়নাল বলল, রশীদ পানিতে ঝুঁবে মরার মানুষ না। শুক্রবারে দেখা হল ভাল যানুষ। তারপর দেখা নাই। এখন শুনি মনে গেছে। বিশ্বাস হয়?

জয়নাল!

জে?

তুই জানিস আমার কি মনে হয়?

কি?

নাওয়াজ খান দিয়েছে।

জয়নাল এসবভাবে আমার দিকে তাকাল যে আমার যাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি বললাম, নাওয়াজ খান অনেক ডেঙ্গুরাস মানুষ!

আপনি কি বলেন মুনীর ভাই! ফিরিশতার মত মানুষ—

না জয়নাল। নাওয়াজ খান ফিরিশতার মত মানুষ না—

আপনি কেমন করে জানেন?

আমি? আমি—মানে ইয়ে—আমি আমতা আমতা করে থেমে গেলাম, আমি আর সলীল যে তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম সেটা বলতে পারলাম না। জয়নাল সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকাল। আমি তাড়াতাঢ়ি বললাম, আমাদের ক্লাসের একজন ছিলে। সে বলেছে।

জয়নাল আমার কথা ঠিক বিশ্বাস করল বলে মনে হল না। যাথা নেতৃত্বে বলল, একজন ভাল মানুষের বদনাম করা ঠিক না।

তুই কেমন করে জানিস সে ভাল মানুষ?

আমি জানি। আমরা গুরীর মানুষ, আমাদের কেউ খোজখবর নেয় না। ডাঙ্ডার সাহেব আমাদের খোজখবর নেন। ঢাকা পয়সা দেন।

জয়নাল, তুই আমার কথা শোন। খবরদার, তুই আর কোনদিন শ্রীন যেডিকেল ক্লিনিকে যাবি না। খবরদার।

জয়নাল আমার কথার উত্তর দিল না। মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, রশীদ ছাড়া তোর পরিচিত আর কেউ মারা গেছে?

জয়নাল যাথা নাড়ল, না। কেউ যারা যায় নাই। খালি—
খালি কি?

তালের আলী— জয়নাল অনিচ্ছিতের মত থেমে গেল।
তালেব আলী কি?

তালেব আলীর খোজ নাই আজ কয়েক শাস।

তালেব আলীটা কে?

আরেকজন মিঠি।

তার খোজ নেই?

না। কিন্তু তালেব আলী পাগলা ফিসিমের। মনে হয় নিজেই কোথাও চলে গেছে।

তালেব আলী কি তোর ফিরিশতা ডাক্তারের কাছে যেতো?

জয়নাল দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল।

আর কেউ কি মারা গেছে কিংবা হারিয়ে গেছে?

রইসে।

রইসেটা কে?

ভূতা পালিশ করত। বাপের সাথে বাগড়া করে চলে গেল।

কোথায় চলে গেল?

কেউ জানে না। রইসের অনেক মাঝা গরম।

তুই কেমন করে আনিস মাঝা গরম? নাওয়াজ খান হয়তো —

জয়নাল ঠোটে আঙুল দিয়ে বলল, না মূলীর ভাই। গরিব শানুষের পোলাপান এইভাবেই মানুষ হয়। এক জাঙগাজ কয়দিন ধাকে, তারপর সেখান থেকে আরেক জাঙগাজ। তারপর আরেক জাঙগাজ।

কি বলিস তুই জয়নাল?

ঠিকই বলি।

তিন তিনজন ছেলে তোর ফিরিশতা ডাক্তারের কাছে যেতো। তিনজনই শেষ আর তুই বলছিস—

বড় শানুষেরা বাকাদের দিকে তাকিয়ে দেখাবে মাঝা নাড়ে জয়নাল সেভাবে মাঝা নাড়ল, তারপর বলল, মূলীর ভাই, গরিবের পোলাপান মরে অনেক বেশি। সেইদিন একজন ট্রাকের নিচে পড়ে পের। এখন আপনি কি বলবেন সেইটাও ডাক্তার সাহেব মেরেছে?

তা আমি জানি না। কিন্তু তুই — খবরদার, আর কখনো গ্রীন মেডিকেল ক্লিনিকে যাবি না। ঠিক আছে?

জয়নাল কিছু না বলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

বল, তুই আর কোন দিন যাবি না। বল।

জয়নাল খুব অনিষ্টার সাথে বলল, ঠিক আছে যাব না।

তার মুখ দেখেই আমি বুঝতে পারলাম সে কথাটা বলেছে আমাকে ঠাণ্ডা করার জন্য। যখন দরকার হবে তখন সে ঠিকই যাবে তার ফিরিশতার মত ডাক্তার নাওয়াজ খানের কাছে। আমার কথা সে একটুও বিশ্বাস করেনি। কিন্তু আমি আর কি করতে পারি?

জয়নালের কাছে রশীদের খুন হয়ে যাবার খবর পেরে আমি গেলাম সঙ্গীলের সাথে দেখা করার জন্য। সঙ্গীল বাসায় নেই, তার কোন মাসীর বাড়ি বেড়াতে গেছে। আমি কি করব বুঝতে না পেরে ফিরে আসছিলাম চৌরাজার মোড়ে হঠাৎ মীনা ফামেসীটা চোখে পড়ল। এটা মতি মিয়ার ফামেসী, বাবা এখানে ওয়েব বিজি করেন।

ফামেসীতে মতি মিয়া আর তার একজন কর্মচারী বসে ছিল। এই কর্মচারীটি নতুন এসেছে, কমবয়সী হাসিখুশি একজন মানুষ। মতি মিয়া আমাকে দেখে আমার একটু যাত্তুরীর ভাল করে বলল, কি খবর?

আমি বললাম, ভাল।

পড়াশোনা কর, নাকি খালি ঘোরাঘুরি?

আমার একটু মেজাজ গরম হল, নিজে চোরাই ওয়েব বিজি করে কিন্তু আমার উপর খবরদারি। আমি মুখ শক্ত করে বললাম, খালি ঘোরাঘুরি।

আমার কথা শুনে কমবয়সী হাসিখুশি কর্মচারীটি হঠাৎ হি হি করে হেসে উঠল, কিছুতেই আর হাসি থামাতে পারে না। মতি মিয়া চটে উঠে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কি বললে?

না, কিছু না।

অন্য মানুষটি তখনো হেসে যাচ্ছে, মতি মিয়া তাকে জোরে একটা দমক দিল, চুপ করবে তুমি?

মানুষটির হাসার বোগ আছে, অনেক কষ্ট করে নিজেকে থামাল। মতি মিয়া আমার দিকে বিদ্যুটিতে তাকিয়ে বলল, মুহূর্মীদের সাথে এইভাবে কথা বলা ঠিক না। আদব-হেগুজ বলে একটা কথা আছে।

আমি আর কথা বাড়ালাম না, দাঢ়িয়ে রইলাম। মতি মিয়া খানিকক্ষণ গজ গজ করে একসময় উঠে দাঢ়িয়ে তার কর্মচারীটিকে বলল, দোকানটা সেখ, আমি বাজারটা সেবে আসি।

জি আছ্জ।

মতি মিয়ার পিছনে পিছনে আবিও উঠে যাইলাম, কর্মচারীটি বলল, তোমার নাম কি?

আমি আমার নাম বললাম।

আমাকে তুমি জরুর দিয়েছ যতি মিয়াকে! জিঞ্জেস করল, পড়াশোনা কর না কি খালি ঘোরাঘুরি। তুমি বললে ঘোরাঘুরি! হি হি হি হি —

লোকটা আবার হাসতে শুরু করে, কিছুতেই হাসি থামাতে পারে না। ব্যাপারটা মোটেও এক হাসির নয়, মানুষটার নিশ্চয়ই হাসির বোগ আছে। হাসি যত অধীরী হোক, এটা সব সময় সংক্রমক, একটু পরে আমিও হাসতে শুরু করলাম।

লোকটা ফার্মেসীর একটা আলমারি খুলে কি একটা কৌটি বের করে দেখান থেকে দুইটা ট্যাবলেট বের করে একটা টিপ করে মুখে দিয়ে আরেকটা আমার দিকে এগিয়ে

দেয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি এটা?

শেয়ে দেখ। ডিটারিন সি। অনেক যজ্ঞ খেতে।

আমি সাধারণে মুখে দিয়ে দেখি সত্যই তাই। চুবে চুবে খেতে খেতে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি সব ওয়ুধ চিনেন?

লোকটা গভীর হয়ে বলল, না চিনলে চলে?

আমি লাল রঙের একটা বোতল দেখিয়ে বললাম, এটা কি ওয়ুধ, বলেন দেখি।

লোকটা মাথা চুলকে বলল, হয় ক্রাড় প্রেশার না হয় ভায়াবেটিস।

সত্যি ধিন্দ্যা কে জানে। আমি আরো কয়েকটা জিজ্ঞেস করলাম, লোকটা কিছু না কিছু বলে দিল। কথা কৈন মনে হল বানিয়েই বলছে — আমি অবিশ্বিয় সেটা নিয়ে মাথা ঘামালাম না। হঠাৎ আলমারিটার উপরে এক জায়গায় দেখি, বাবার ভেজাল ওয়ুধগুলি সাজানো। আমি হাত দিয়ে দেখিয়ে বললাম, এটা কিসের ওয়ুধ?

এটা এন্টিবায়োটিস।

সেটা দিয়ে কি হয়?

ইনফেকশান হলে খেতে হয়।

কিসের ইনফেকশান?

কৃত রকম ইনফেকশান আছে। কিডনি, লিভার, ক্রেন। লোকটা খুব গভীর ভাব করে হাত নেড়ে বলল, এন্টিবায়োটিস ছাড়া আঘাতকাল একটা দিনও যায় না।

হঠাৎ করে আমার মাথায় একটা বুরু খেলে গেল। আমি চোখে মুখে একটু অবাক হয়ে ভাবান করে বললাম, আমাকে ওয়ুধটা দেখাবেন? একটু দেখি।

লোকটা মুখে তাছিলের ভান করে ওয়ুধের বাঞ্চটা নামিয়ে এনে খুলে শিশিটা বের করে আমাকে দেখাল, বলল ক্যাপসুল।

আমি চোখে মুখ বিশ্বায়ের ভান করে বললাম, কি সুন্দর! আমাকে একটা ক্যাপসুল দেবেন?

লোকটা খুব অবাক হয়ে বলল, তুমি ক্যাপসুল দিয়ে কি করবে?

সাজিয়ে রাখব।

লোকটা খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বোবার চেষ্টা করল আমি ঠাট্টা করছি বিনা। আমি চোখে মুখে ঘত্টুকু সন্তুর একটা সরল ভাব ফুটিয়ে রাখার চেষ্টা করলাম। লোকটা বলল, ওয়ুধ কি সাজিয়ে রাখার জিনিস?

কি হয় সাজিয়ে রাখলে? মানুষ সুন্দর জিনিস সাজিয়ে রাখে না?

লোকটা আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না, অসম্ভব বোকার ভাত কোন প্রশ্ন করলে তার উত্তর দেওয়া খুব মুশকিল। লোকটা খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে আবার হি হি করে হাসতে শুরু করল, কিছুতেই আর হাসি থামাতে পারে না।

হাসতে হাসতে সে সত্যি সত্যি শিশিটা হাতে নিয়ে সেখান থেকে একটা ক্যাপসুল বের করে আমার হাতে দিল। আমি যখন ক্যাপসুলটা নিয়ে বের হচ্ছি তখনো সে

হি হি করে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি থাকে।

ভারি মজার মানুষ তাতে কেন সন্দেহ নেই। কিন্তু বাবার ভেজাল ওয়ুধের একটা প্রমাণ সে হাতে হাতে দিয়ে দিল, নিজে না রেনেই!

১০. বিশ্বেফারণ

বহুস্পতিবার দিনটিতে মনে হয় গোড়া থেকেই কিছু গোলমাল হিল। সকালে ঘূম থেকে উঠে দেখি লাক্কুর ঘুর। মাঝে মাঝেই কেন জনি লাক্কুটার ঘুর উঠে। তখন কেমন যেন চুপচাপ হয়ে শুয়ে থাকে। দেখেই কেন জানি মন খারাপ হয়ে যায়।

শ্বেত গিয়েও গোলমাল। ক্লাস কেপ্টেন খামাখা আমার নাম লিখে স্যারের কাছে নালিশ করল, আমি নাকি ক্লাশে গোলমাল করেছি। স্যার তখন আমাকে একেবারে যাতা বলে বকাবকি করলেন। জীবনের উপর বিড়ঞ্চা এসে গেল সেই বকাবকি শুনে।

টিফিন ছুটির সময় কাশেম আমার একটা বই কেড়ে নিল। লাইব্রেরি থেকে এনেছি, এখনো পড়া হয়নি। সেটা কেরেৎ নিতে গিয়ে মহা গোলমাল, ছেটখাতি ধাক্কাধাক্কি ছাড়া অবশ্যি আর কিছু হল না, সলীল পাশে না থাকলে মনে হয় মার খেয়ে ভূত হয়ে যেতাম।

বিকাল বেলা হঠাৎ দেখি, কলম থেকে কালি চুইয়ে শার্টের পকেটজা মাখাদারি হয়ে গেছে, বাসায় পৌছানোর পর মা যা একটা কাণ্ড করবেন সেটা আর বলার নয়।

শ্বেত ছুটির পর বাসায় আসতে আসতে রাস্তার মোড়ে আমি একটা আছাড় খেলাম। শুকনো ঠনঠনে রাস্তা, আছাড় খাওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। কিন্তু আমি তার মাঝে আছাড় থেকে ফেললাম। একটা দিন কেমন যাবে সেটা যানে হয় গ্রহ নক্ষত্র দিয়ে বিচার করা যায়। আজকে নিশ্চয়ই সবগুলি শুহু নক্ষত্র আমার জন্যে সবচেয়ে খারাপ খারাপ জায়গায় গিয়ে হাজির হয়েছে। আছাড় থেকে হাঁটুর ছাল উঠে গেছে কিন্তু সেটা নিয়ে আমি ব্যাস্ত হতে পারলাম না। সামনে নিচু ক্লাসের কয়জন ছেলে হিল, তারা এমন জোরে হাসতে শুরু করল যেন ভারি মাজার একটা ব্যাপার হয়েছে। মানুষ আছাড় থেকে যে দেখে হাসতে হয় না এই জিনিসটা মনে হয় কেড়ে তাদের শেখায়নি।

দিনটা যে খুব খারাপ যাচ্ছে সেটা নিয়ে একেবারে নিশ্চলেহ হয়ে গেলাম যখন বাসায় এসে দেখি, বাবা এসেছেন। অনেক দূর থেকে তাঁর ঘড়ঘড় শব্দ করে জিব পরিষ্কার করার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আজকে বাবার আসার কথা নয় কিন্তু আমার সর্বনাশ পুরো করার জন্যে মনে হয় একদিন আগে এসে হাজির হয়েছেন।

বাসায় চোকার আগে খানিকক্ষণ বারান্দায় বসে রইলাম। মনটা এত খারাপ হয়েছে যে বলার নয়। মনে হতে লাগল, সলীলের সাথে পালিয়ে গিয়ে বেদে হয়ে যাওয়াটা এমন কিছু খারাপ ব্যাপার নয়। পড়াশোনা করে কি হবে?

আমাকে দেখেই বাবাৰ মুখ শক্ত হয়ে গেল কিন্তু আমাকে কিছু বললেন না। প্ৰত্যেকবাৰই বাবা পূৰো ব্যাপারটা আগেৰবাৰ থেকে একটু ভিন্ন ভাবে কৰেন। কোন কথা না বলাটা মনে হয় একটা নতুন কাময়া।

আমি বাবাকে পাশ কঢ়িয়ে টেবিলৰ উপৰ বইগুলি থেকে বাস্তবে গিয়ে হাজিৰ হলাম। মা চূলা থেকে ডেকচিটা নামিয়ে আমাৰ দিকে তাকিয়ে চোখ কপালে তুলে বললেন, নতুন শাটো এইভাৱে নষ্ট কৰেছিস?

কলম থেকে কলি বেৰ হয়েছে—

মা গৰ্জন কৰে বললেন, সাবধানে বাখতে পাৰিস না? কোন জংগলৰ ভূত হয়েছিস তুই?

সন্তো কলম, আমি কি কৰিব?

সন্তো কলম? মা মুখ বিচিয়ে বললেন, লাট সাহেবেৰ জন্যে সোনাৰ কলম কিনে আনতে হৈব!

আমি রাজাঘৰ থেকে বেৰ হয়ে এলাম, এমনিতে বাবাৰ পিলুলী থেয়ে আসছি, এখন তাৰ সাথে মাহেৰ মুৰ বিচুলী যোগ হল। জীবনেৰ উপৰ বিত্তফা এসে গেল হঠাৎ। রাজাঘৰেৰ বাবান্দায় দাঢ়িয়ে আছি, তখন হঠাৎ দেখি বাবা শোৰাৰ দৰ থেকে লাবলুৰ কান ধৰে টেনে আসছেন। লাবলুৰ মুখ ভয়ে একেবাৰে ছাইয়োৱে যত সদা হয়ে গেছে। একটু আগে দেখেছি জুৱে কাহিল হয়ে লাবলুৰ বিছানায় শুয়ে আছে। তাকে যে বাবা কান ধৰে টেনে আসবেন আমি কখনো কল্পনাও কৰিনি।

আমাৰ মাথাৰ বাখে হঠাৎ কেমন জানি একটু গোলমাল হয়ে গেল। কেমন কৰে হল বা কেন হল সোটা আমি জানি না কিন্তু কিছু একটা ঘটে গেল তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি তখন হঠাৎ একটা অসন্তুষ্টিৰ সাহেবেৰ কাজ কৰে ফেললাম। রাজাঘৰেৰ বাবান্দায় দাঢ়িয়ে হৃষ্ট দেওয়াৰ যত কৰে বললাম, বাবা, লাবলুকে ছেড়ে দেন।

বাবাৰ মাথাৰ উপৰ বাজ পড়লেও মনে হয় বাবা এত অবাক হত্তেন না। তাৰ মুখ মাছেৰ যত হ্য হয়ে গেল, চোখ দুটি গোল কৰে আমাৰ দিকে তাকিয়ে রইলেন। শুধু যে আমাৰ দিকে অবাক হৰে তাকিয়ে রইলেন তাই নয়, সত্যি সত্যি লাবলুকে ছেড়ে দিলেন। তাকে দেৰে মনে হতে লাগল তাৰ ভিতৰে কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে। কি হচ্ছে কিছুই আৱ বুকতে পাৰছেন না। কয়েক সেকেণ্ড সেভাৰে গেল, তাৰপৰ হঠাৎ কৰে বাবা নড়ে উঠলেন, তাৰ চোখ মুখ হাত পা শৰীৰ কেমন যেন কিলাবিল কৰে উঠল। মুখ বক কৰে বড় একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, কি বললি?

আমি হঠাৎ কৰে বুকতে পাৰলাম যা হৰাৰ হয়ে গেছে, এখন আৱ পেছনোৰ উপায় নেই। গলাব থৰটাকে থাভাৰিক রাখাৰ চেষ্টা কৰে বললাম, বলোছি লাবলুকে ছেড়ে দেন। ওৱ জুৰ উঠেছে, শুধু শুধু মাৰবেন না।

মা রাজাঘৰ থেকে বেৰ হয়ে এলেন। আমি চোখেৰ কোণা নিয়ে দেখলাম, দৰজা ধৰে দাঢ়িয়ে আছেন, মনে হয় নিজেৰ চোখকে বিশ্বাস কৰতে পাৰছেন না। কি একটা

বলতে গিয়ে থেমে গেলেন, তাৰপৰ হঠাৎ শাঢ়িৰ আচল দিয়ে মুখ তেকে ফেললেন।

লাবলু ছাড়া পেয়েও তখনো সবে যায়নি। অবাক হয়ে আমাৰ দিকে তাকিয়ে আছে। তাৰ মুখ ভয়ে আৱো সদা হয়ে গেছে। একটু আগে ভয়টা ছিল নিজেৰ জন্যে, এখন ভয়টা আমাৰ জন্যে।

বাবা প্ৰচণ্ড রাগে কি কৰবেন বুকতে না পেৰে হঠাৎ একটা ট্ৰাকেৰ যত আমাৰ দিকে ছুটে এলেন, কাছে এসে একেবাৰে বাবেৰ যত আমাৰ উপৰ লাফিয়ে পড়লেন।

আমি ব্যাপারটাৰ জন্যে প্ৰত্যুত ছিলাম, ঠিক সময়মত একটা লাফ দিয়ে সবে গোলাম, বাবা আমাকে ধৰতে পাৰলৈন না। বাবা স্থপুণ্ড এৱকম একটা জিনিস চিন্তা কৰেননি। তাৰ একেবাৰে পুৱোপুৱি মাথা খাৱাপ হয়ে গেল। সেখান থেকে ঘূৰে দাঢ়িয়ে আমাৰ দিকে তাকালেন।

বেগে গেলে মানুষেৰ চেহাৰা খুব খাৱাপ হয়ে থায়। বাবাৰ চেহাৰা এমনিতেই আগে কেৱলদিন আমাৰ ভাল মনে হয়নি, এখন এই ভয়ংকৰ রাগে চেহাৰা এত খাৱাপ দেখাতে লাগল যে, সেখে আমাৰ শৰীৰ কেমন জানি শিভিৰে উঠে। চোখ দুটি লাল হয়ে আছে, নাকেৰ গৰ্তগুলি বড় বড়, মুখ হ্য কৰে বড় বড় নিঃশ্বাস নিজেৰে, যুক্তে ভিতৰে যৱলা হলুদ দীপ্ত, দুত্তনিতে এক গোছা দাঢ়ি নড়ছে। কি কূৎসিত একটা দৃশ্য! বাবা পোঁজনোৰ যত শব্দ কৰতে কৰতে চিৎকাৰ কৰে বললেন, শুওৱেৰ বাচা, আজকে আমি তোকে খুন কৰে ফেলব, একেবাৰে জৰাই কৰে ফেলব।

বাবা সেই জারগা থেকে আৱেকটা লাফ দিলেন। আমি তখন শৰীয়া হয়ে পেছি, আমি জানি আমাকে ধৰতে পাৰলৈ বাবা আমাৰ গলা টেনে ছিড়ে ফেলবেন। আমি আৱো জোৱে একটা লাফ দিয়ে সবে গোলাম, বাবা আমাকে ধৰতে পাৰলৈন না বৱহং তাল হায়িয়ে কেমন যেন হয়ে পড়ে গেলেন। বৱহং যানুহ, লাফ-খাপ দিয়ে অভ্যাস নেই। মনে হল পড়ে গিয়ে খুব ভাল যত একটা চোট খেলেন, উঠে দাঢ়াতে তাৰ একটু অসুবিধা হল, শেষ পৰ্যন্ত যখন উঠে দাঢ়িয়ে আমাৰ দিকে তাকালেন। আমি বুকতে পাৰলাম, আমাৰ বৈচে থাকাৰ আৱ কেৱল সন্তুষ্টান্তৰ নেই। বাবা একল সত্যি সত্যি আমাকে মোৱে ফেলবেন। যৱে যাওয়াৰ সময় নাকি পুৱো জীবনেৰ শৃঙ্খল চোখেৰ সামনে দিয়ে ভেসে বার। একটু পৱেই আমি দেখব সোটা সত্যি কি না!

বাবা বাবান্দায় দাঢ়িয়ে এদিকে সেদিকে তাকালেন। হাতেৰ কাছে কিছু না পেয়ে হঠাৎ রাজাঘৰে চুক্তি থাক কাটিটা নিয়ে বেৰ হয়ে এলেন। তাৰ চোখ ধৰক ধৰক কৰাচে। হাতে একটা বটি। কি ভয়ংকৰ একটা দৃশ্য! আমাৰ বৰ্জ একেবাৰে হিম হয়ে গেল।

রাজাঘৰেৰ বাবান্দায় দাঢ়িয়ে থেকে বাবা বটিটা উপৰে তুল ফ্যাসফ্যাসে এক বৰকমেৰ গলায় বললেন, হারামজাদা, তুই যদি এক পা নড়িস তোকে খুন কৰে ফেলব। একেবাৰে খুন কৰে ফেলব, জানোয়াৰেৰ বাচা—

বটিটা আমাৰ দিকে ঝুঁড়ে মাৰবেন কিনা জানি না কিন্তু সোটা নিয়ে চিন্তা ভাৱনা

করার সময় নেই। বাবা ডান হাতে ধরে বটিটা মাথার উপরে তুলে এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছেন। এক লাফ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করা দায় কিন্তু সত্যি ঘনি কোপ মেরে বসেন?

বাবা নাক দিয়ে ফৌসফোস করে নিঃশ্বাস নিয়ে আবার দুই পা এগিয়ে এলেন। আমি তাঁর হাতের দিকে তাকিয়ে আছি। সত্যি কি আমাকে কোপ মেরে বসবেন? খবরের কাগজে তো দেখি মাঝে মাঝে বাবা ছেলেকে কিংবা ছেলে বাবাকে মেরে ফেলেছে। ব্যাপারগুলি এভাবেই হয় তাহলে!

বাবা তখন আরো দুই পা এগিয়ে এলেন। আমি তখন মরীচা হয়ে আরো একটা সাহসের কাষ করে ফেললাম। চিংকার করে কললাম, সবাইকে বলে দিব আমি। সবাইকে —

কি বলবি? বাবা হংকার দিয়ে বললেন, কি বলবি শুণের বাঢ়া?

আপনি ওয়ুধ চুরি করেন। ভেজাল ওয়ুধ বিক্রি করেন। আমার কাছে প্রমাণ আছে।

বাবা এক সেকেন্ডের জন্যে কেমন জানি হকচকিয়ে গেলেন। তাঁর চোখ হঠাতে ঘোলাটে হয়ে গেল, শরীর কাঁপতে লাগল, মুখ হ্যাহ্যে হয়ে গেল এবং সেই অবস্থায় মুখে আঁ আঁ শব্দ করে বটিটা নিয়ে ছুটে এসে আমাকে কোপ মেরে বসলেন। আমি শেষ মুহূর্তে লাফ মেরে সরে গেলাম বলে আমার গাছে লাগল না, বটিটা পিছনের কাঠের দরজায় গেঁথে গেল ইঞ্জিখানেক।

বাবা সেটা টেনে বের করার চেষ্টা করতে শাগলেন আর হঠাতে করে আমার ভিতর থেকে সব ভয় চলে গেল। হঠাতে করে আমার মনে হল, আমি বুঝি অনেক বড় হয়ে গেছি। আমি কেমন জানি হতবাক হয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে রইলাম। এই যানুষটা আমার নিজের বাবা। আমাকে কৃপণ্যে মেরে ফেলতে চাইছে? আমার নিজের বাবা!

গভীর কেমন একটা দুর্ঘে হঠাতে আমার বুকটা কেমন জানি হ হ করে উঠে।

মা তখন হঠাতে চিলের মত চিংকার করে ছুটে এসে বাবাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। ইউয়াডি করে কাঁদতে লাগলেন, কি সব কলতে লাগলেন আমি তাঁর কিছু বুকতে পারলাম না। লাবলুটা ছুটে এসে চিংকার করে আমার হাত ধরে কাঁপতে শুরু করল। বাবা তখনে মায়ের হাত থেকে ছুটে আসতে চেষ্টা করছিলেন কিন্তু মা শক্ত করে ধরে রাখলেন। বাবা সেই অবস্থায় কাঁপতে কাঁপতে আমার দিকে হাত দেখিয়ে কললেন, বের হয়ে যা। শুণের বাঢ়া, বের হয়ে যা তুই বাসা থেকে —

আমি সোজাস্মি বাবার চোখের দিকে তাকালাম, আর কি আশ্চর্য! বাবা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলেন না, চোখ সরিয়ে নিলেন। সেইভাবে চিংকার করে কললেন, বের হয়ে যা—এই মুহূর্তে বের হয়ে যা —

আমি আর কোন কথা বললাম না। ঠিক সেইভাবে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। মা চিংকার করে কি যেন বলছেন, লাবলুটা কাঁদছে কিন্তু কিছুই আমার কানে আসছিল

ন।
কিছুই না।

১১. একা একা

আমি রাত্তা ধরে ইঠিছি। ভাগিস অঙ্ককার হয়ে গেছে, তাই আমি যে হ হ করে কাঁদছি সেটা কেউ দেখতে পাচ্ছে না। প্রথম ঘটাখানেক আমি কোথায় কোথায় হেঁটেছি নিজেও জানি না। শুধু মনে হচ্ছিল — বেতে থেকে কি হবে? ঘরে যাই না কেন? এক—দুই বার যখন রাত্তা দিয়ে একটা ট্রাক বা বাস গিয়েছে, মনে হচ্ছিল, লাফিয়ে পড়ে যাই সেগুলির সামনে। ঘটাখানেক পর আমার মন একটু শাস্ত হল। আমি তখন স্কুলের দেয়ালে পা দুলিয়ে বসে রইলাম। যেখানে বসেছি জায়গাটা একটু অঙ্ককার, লোকজন আমাকে দেখতে পাচ্ছিল না। একজন দুইজন হঠাতে হঠাতে একটু অবাক হয়ে তাকিয়েছিল কিন্তু আমি গা করলাম না। কোন কিছুতেই এখন আর কিছু আসে যায় না।

বাবা আমাকে বাসা থেকে বের করে দিয়েছেন, আমি আর কোনদিন বাসায় ফিরে যাব না। পুরিবীতে কত বাঢ়াই তো আছে যাদের বাবা নেই, মা নেই, একা একা জীবন কাটিয়ে দেয়। আমি সেভাবে জীবন কাটিয়ে দেব। ভূতা পালিশ করে ফেরিওয়ালা হয়ে মিস্টির কাজ করে কোন না কোনভাবে বেতে থাকব। সবাই যে পড়ালোকা করে ভাঙ্গার ইঞ্জিনিয়ার হবে সেটা তো সত্য নয়। কাটিকে বাটিকে কুলি মন্তুর, রিকশাওয়ালা তো হতে হবে। তাই হব আমি। ট্রেনে করে চলে যাব ঘড়দূর যাওয়া যাও। দূরে কোন শহরে, অজানা কোন গ্রামে। অসুখ—বিসুখ হয়ে ঘরে গেলে তো ভালই। চূপচাপ কোন গাছের নিচে শুয়ে মনে যাব আমি। আমার কথা আর কে ভাববে! গভীর মুঠোখে আমার চোখে পালি এসে গেল হঠাতে।

আরো যখন রাত হল তখন হঠাতে করে ফশা কামড়াতে শুরু করল। এখানে আর বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। কোথায় যাওয়া যায় চিন্তা করছিলাম, প্রথমে ভাবলাম, কেল স্টেলেন গিয়ে শুয়ে থাকি। কত গরিব ধানুষ শুয়ে থাকে ঠাণ্ডা মেঝেতে, আর একজন বেলি হলে কতি কি?

ঠিক তখন আমার ভাকল চৌধুরীর গাছবরের কথা মনে পড়ল! কি আশ্চর্য, সবচেয়ে প্রথমেই তো আমার গাছবরের কথা মনে পড়ার কথা ছিল। রাগে দুর্ঘে অভিযানে মাথাটা গরম হয়ে আছে বলে এতক্ষণ মনে পড়েনি। হঠাতে করে আমি আমার বুকের ভিতর কেমন জানি একটা বল অনুভব করাতে থাকি। আমি যতদিন ইচ্ছা গাছবরে থাকতে পারি। আমার আর ভয় কি?

আর তখন কয়টা বাজে আমি জানি না। আমি সেটা নিয়ে আর মাথা ধামালাম না। তখন তখনই স্কুলের দেয়াল থেকে নেমে নদীর দিকে ইঠিতে শুরু করলাম। অনেকটু

রাস্তা, সলীলের সাথে গম্ভীর করতে করতে হেঁটে গেছি বলে আগে কখনো টের পাইনি। দিনের বেলা রাস্তাটি কত পরিচিত মনে হয়, এখন রাত্রিকেলো সবকিছু কেশন বিচিত্র মনে হচ্ছে। গাছগুলিকে মনে হয় মানুষ, ঘোপগুলিকে মনে হয় কোন ধরনের জন্ম জানোয়ার, আর হঠাৎ হঠাৎ করে যথন রাস্তার পাশে খেকে বুক্কুর বিড়ল ফিলু একটা বের হচ্ছে আসে, আমি এত জোরে চমকে উঠি যে, সেটা আর বলার মত নয়! অঙ্ককারে হাঁটতে হাঁটতে আমার কত কি মনে হয়! কেমন জানি এক ধরনের অভিযান হচ্ছে থাকে। কার উপরে অভিযান কে জানে! চোখে পানি এসে যায় একটু পরে পরে।

জারুল চৌধুরীর বাসায় গিয়ে দেখি পূরোটা ঝুঁটিটে অঙ্ককার। কে জানে বাসায় নেই নাকি খুমিয়ে গেছেন। কত রাত হয়েছে জানি না, কিন্তু জারুল চৌধুরী বলেছেন তিনি নাকি অনেক রাত জেগে বই পড়েন। হয়তো বাসায় নেই, ঢাকা চলে গেছেন। এই অঙ্ককারে বিজন বনে আমি একা চিন্তা করেই আমার কেমন জানি ভয় করতে থাকে।

আমি অঙ্ককার হাতড়ে হাতড়ে গাছঘরের নিচে এসে সাবধানে গাছের ফোকড়ে হাত দিতেই সত্ত্ব সত্ত্ব ছেট একটা প্লাস্টিকের কোটা পেলাম। এর মাঝে গাছঘরের চারিটা। সেটা হাতে নিয়ে আমি হাতড়ে হাতড়ে খুল থাকা দড়িটা বের করে একটা হ্যাচক টান দিলাম, সাথে সাথে উপর থেকে দড়ির মহিটা ঝপাং করে এসে নিচে পড়ল। জারুল চৌধুরী গাছের নিয়ে যা যা বলেছিলেন সত্ত্ব সত্ত্ব তাই করেছেন! আমি সাবধানে যাই বেয়ে উপরে উঠে গেলাম। অঙ্ককারে চাবি দিয়ে দরজায় লাগানো তালাটা খুলতে বেশ কষ্ট হল, শেষ পর্যন্ত সেটা খুলে আমি যাখা নিচু করে ভিতরে ঢুকলাম। যাম পাশে তাকের মাঝে একটা ম্যাচ আর যোমবাতি থাকার কথা। সত্ত্ব সত্ত্ব সেটা পেয়ে গেলাম। যোমবাতি হ্যালাতেই ভিতরে কেমন জানি এক ধরনের স্বত্ত্ব আর নিরাপদের ভাব চলে এল। আমি যাইটা টেনে তুলে দরজাটা বন্ধ করে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়লাম।

গাছের উপর ছেট পুরুলের ঘরের মত একটা ঘর, তার মাঝে গভীর রাতে আমি একা একা বসে আছি। পুরো ব্যাপারটা চিন্তা করেই আমার কি বিচিত্র লাগতে থাকে! আমি গাছঘরের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে তাকালাম। ছেট ছেট তাক, তার মাঝে বইপত্র কাগজ কলম। ছেট ছেট টিন, খুলে দেখি সেগুলিতে চিঠি সুতি আর গুড়। একটা পানির বোতল, কবেকার পানি কে জানে। দেয়ালে একটা টর্চলাইট, একটা চাকু আর একটা দড়ি খুলছে। ঘরের এক কোণায় ছেট একটা তোমকের মত জিনিস গুটানো, এটা নিচয়ই স্লিপিং ব্যাগ হচ্ছে। আমি স্লিপিং ব্যাগটা খুলে ফেললাম। সত্ত্বই চমৎকার একটা বিছানা, ভিতরে চুকে গেলে একই সাথে তোমক এবং লেপ হয়ে যাব! বালিশ নেই, কিন্তু বালিশ না হলে আর কতি কি? কোথায় জানি পড়েছিলাম বালিশ ছাড়া খুমানো নাকি খাল্লাকর!

আমি কয়েক মুঠি চিঠি খেয়ে স্লিপিং ব্যাগের ভিতরে চুকে গেলাম। ভিতরে কি

চমৎকার কূনুম দ্বন্দ্ব গরম! আরামে আমার চোখ বন্ধ হয়ে এল। আমি ঝুঁ সিয়ে মোমবাতিটা নিখিলে দিলাম। সাথে সাথে গাঢ় অঙ্ককারে চারিদিক দেকে গেল।

জায়গাটা কি আর্চর্চ নির্জন সুমসাম। হঠাৎ হঠাৎ রাতের পাখি দেকে উঠে, ডানা কাপটায়। যাকে মাঝে নিশাচর কোন একটা প্রাণী ছুটি যায়, কে জানে কি রকম প্রাণী। এ ছাড়া আর কোথাও কোন শব্দ নেই।

আমি চুপচাপ শুয়ে থাকি। আমার বাবার কথা মনে পড়ে, মামের কথা মনে পড়ে, লাবলুর কথা মনে পড়ে। কে জানে লাবলু ছুটা কমেছে কিনা। শুয়ে শুয়ে আমার লাবলুর কথা মনে পড়ে। কে জানে লাবলু ছুটা কমেছে কিনা। শুয়ে শুয়ে পড়লাম।

রাতে খুব ভাল খুব হল না, হবে আমি সে রকম আশাও করিনি। একটু পরে পরে ঘুম ভেঙে যাছিল আর আমি চমকে চমকে উঠছিলাম। শেষবারের দিকে অবিশ্বিত আমি বেশ ভালভাবেই ঘুমিয়ে গেলাম। ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। প্রথমে বুরতে পারলাম না আমি কোথায়, হঠাৎ করে আমার সব কথা মনে পড়ল আর মন্তো এত খারাপ হল যে, বলার নয়। আমি উঠে বসে জানাপাটা খুলে বাইরে তাকালাম, অবছ আলো হচ্ছে। কি সুন্দর লাগছে চারিদিকে! আমি সুন্দৃ হয়ে তাকিয়ে রইলাম। ভোরকেলা খুব আছে। কি সুন্দর লাগছে চারিদিকে! আমি সুন্দৃ হয়ে তাকিয়ে রইলাম। প্রথমে বুরতে এত চমৎকার একটা ব্যাপার। মানুষের মন এখনিতেই তখন ভাল হয়ে যায়। প্রথমীতে এত যে খারাপ মানুষ আছে আর এত যে খুনখারাপী, চুরি ভাকাতি হয়, আমি একেবারে বাজি ধরে কগতে পারি এরকম ভোরবেলায় কখনো কোথাও কোন খোরাপ কাজ হয় না। কিছুক্ষণের জন্যে প্রথমীতে সব মানুষ ভাল হয়ে যায়।

একটু বেলা হলে আমি জারুল চৌধুরীর সাথে কথা বলতে গিয়ে দেখি তাঁর দরজায় এই এত বড় একটা তালা খুলছে। জারুল চৌধুরী এমনিতে নিজের দরজায় কোন তালা লাগান না, নিচয়ই কয়েকদিনের জন্যে অন্য কোথাও গেছেন। আমার একটু শব্দ লাগান না, নিচয়ই কয়েকদিনের জন্যে আমার বুকটা একেবারে হাঁশফুশ করছে।

জারুল চৌধুরীকে না দেখে আমি ভাবলাম সলীলের বাসায় যাই, কিন্তু আজ স্কুল থেকা, সে নিচয়ই স্কুল ঘুরে যাবে। আমার বইপত্র কলম কিছু নেই, স্কুলে যাবার কোন প্রশ্নই আসে না। কি করব বুরতে না পেরে আমি হাঁটতে বের হলাম। আমি কোন প্রশ্নই আসে না। কি করব বুরতে না পেরে আমি হাঁটতে বের হলাম। আমি কেবল নিজের জিনিস আবিষ্কার করলাম। গ্রামে অনেক বাচ্চা আছে যারা কখনোই স্কুলে যায় না। স্কুলে না যিয়ে তারা যে খেলাখুলা করে কেড়াছে অনেক সেটা সত্ত্ব নয়। সবাই কোন না কাজ করছে। অনেকে গরু মাটে নিয়ে যাচ্ছে, অনেকে কেতে নিড়ানি দিচ্ছে, অনেকে ঘাস কাটছে, আবার অনেকে মাছ ধরছিল। প্রথমে কাদামাটি দিয়ে একটা ভোরব পালে অনেকগুলি বাচ্চা মিলে যাচ্ছে ধৰছিল। প্রথমে কাদামাটি দিয়ে একটা ছেট অংশ আলাদা করে গামলা দিয়ে পানি নেচতে শুরু করল। পানি হথন করে

হাঁটতে হাঁটতে আমি বেশ কিছু জিনিস আবিষ্কার করলাম। গ্রামে অনেক বাচ্চা আছে যারা কখনোই স্কুলে যায় না। স্কুলে না যিয়ে তারা যে খেলাখুলা করে কেড়াছে অনেক সেটা সত্ত্ব নয়। সবাই কোন না কাজ করছে। অনেকে গরু মাটে নিয়ে যাচ্ছে, অনেকে কেতে নিড়ানি দিচ্ছে, অনেকে ঘাস কাটছে, আবার অনেকে মাছ ধরছে। নদীর ধারে একটা ভোরব পালে অনেকগুলি বাচ্চা মিলে যাচ্ছে ধৰছিল। প্রথমে কাদামাটি দিয়ে একটা ছেট অংশ আলাদা করে গামলা দিয়ে পানি নেচতে শুরু করল। পানি হথন করে

এল তখন দেবি অনেক রকম মাছ দেখানো কিনবিল করে বেড়াচ্ছে। বাঢ়াগুলি হাতড়ে হাতড়ে সেগুলি ধরতে লাগল। আমি খুব অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম দেখে একজন বলল, মাছ ধরতে চাও?

আমি মাথা নাড়তেই সে বলল, আস তাহলে ধর!

আমি শার্টের হাতা গুটিয়ে মাছ ধরতে শুরু করলাম। ব্যাপারটা দেখতে যত সহজ মনে হয় আসলে মোটেও তত সহজ নয়। হাত থেকে পিছলে বের হয়ে যায়। আমার মাছ ধরা দেখে বাঢ়াগুলি হেসেই বাঁচে না। মাছ ধরার যাবে যে কোন বিপদ থাকতে পারে আমার একবারও মনে হয়নি, কিন্তু হঠাৎ একটা শিং মাছ বুড়ো আঙুলে ধাই দেরে বসল। আমি চিন্কার করে উঠে নাড়লাম। একজন জিঞ্জেস করল, শিং মাছ মেরেছে?

আমি মাথা নাড়লাম, বুড়ো আঙুল থেকে রক্ত বের হয়ে গেছে। ছেলেটা মাথা নেড়ে বলল, শিং মাছ বড় বাচর, ঠিক করে ধরতে হয় উপর থেকে চেপে, না হলে ধাই দেরে দেয়। অনেক ব্যথা করবে এখন।

সত্ত্ব সত্ত্ব অনেক ব্যথা শুরু হয়ে গেল। ছেঁটি মতন একটা বাঢ়া বলল, আঙুলের যাবে পেশার কর, ব্যথা করবে।

আমি প্রথমে ভাবলাম ছেলেটা আমার সাথে ফাঙলেমি করছে, কিন্তু দেখলাম অন্য স্বাই মাথা নাড়ল, ফাঙলেমি নয়, এটা চিকিৎসা। এরকম চিকিৎসায় আমার বেশি ভরসা নেই, আমি হাত ধূয়ে উঠে এলাম। যখন চলে আসছিলাম একজন বলল, তোমার মাছগুলি নিয়ে যাও।

আমি বললাম, আমার লাগবে না! তোমরা নিয়ে নাও।

দেখতে দেখতে আঙুলটা ঘূলে উঠল। আমি হেঁটে হেঁটে ফিরে এলাম। জানল চৌধুরী এখনো ফিরে আসেননি। আমি খানিকক্ষণ বারান্দার বসে থেকে আবার গাহচরে ফিরে গেলাম। মনটা এত খারাপ হয়ে আছে যে, বলার নয়। খুব বিদে পেয়েছে কিন্তু শুকনো চিড়া চিবিয়ে খাওয়ার ইচ্ছে করল না। আমি গাহচরের মেবেতে লম্বা হয়ে শুয়ে রইলাম। পেটে বিদে, হাতে ব্যথা। মনটা খুব খারাপ। কেন জানি শুধু লাবলুর কথা মনে হচ্ছে। আমি শুয়ে শুয়ে খানিকক্ষণ কাঁদলাম, তারপর মনে হয় একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি খুব বিচিত্র একটা স্বপ্ন দেখলাম। আমি একটা নদীর উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। নদীর পানি কুচকুচে কাল। সেই পানির নিচে লম্বা লম্বা ঝুঁড়ের অঞ্চল। সেগুলি আমাকে ধরতে আসছে আর আমি তার মাঝে হেঁটে যাচ্ছি। হঠাৎ আমাকে কে যেন ডাকল, মূনীর!

আমি তাকিয়ে দেখি, বাবা। বাবার হাতে একটা বন্দুক। বাবা বন্দুকটা আমার দিকে তাক করে থেরে আবার ডাকলেন, মূনীর!

আমি ভয় পেয়ে ছুঁটতে শুরু করলাম, তখন বাবাও আমার পিছনে পিছনে ছুঁটতে

লাগলেন। কিন্তু আবি যেরকম পানির উপর দিয়ে লৌড়াতে পারি, বাবা পারেন না। পানিতে পা দিতেই বাবা ভুবে গেলেন আর সবগুলি অঞ্চলে পানি এসে বাবাকে প্যাচিয়ে ধরল। বাবা তখন চিৎকার করতে লাগলেন, মূনীর মূনীর মূনীর।

আবি ঠিক তখন আবার ঘুম ভোঞে গেল, ওনি সত্ত্বাই কে যেন আমাকে ডাকছে, মূনীর, এই মূনীর।

আবি চোখ খুলে দেবি সলীল। আমার মুখের উপর উবু হয়ে বলে আছে। আমি ধড়মুক করে উঠে বসলাম, বললাম, সলীল! তুই?

সলীল দাত বের করে হেসে বলল, আমি ঠিক ভেবেছি তুই এখানে থাকবি! ঠিক ভেবেছি।

আমার তখনো চোখে ঘুমের ঘোর, চোখ কচলে বললাম, কেমন করে বুবালি?

না বোবার কি আছে? সলীল হাতে কিন দিয়ে বলল, তুই যদি বাড়ি থেকে পালাস তাহলে আর কোথায় যাবি?

আমি বাড়ি থেকে পালাইনি, বাবা বের করে দিয়েছে।

ঐ একই কথা!

মোটেও এক কথা না। বাবাকে তুই চিনিস না। আরেকটু হলে বটি দিয়ে কৃপিয়ে শুন করে ফেলত।

সলীল কিছু বলল না, আমিও আর সেটা দিয়ে কিছু বললাম না। সলীলকে দেখে এত ভাল লাগছে যে, বলার নয়। ইচ্ছে হচ্ছিল একেবারে ঘড়িয়ে ধরি কিন্তু হাজার হলেও বড় হয়ে যাচ্ছি, কাজেই আবি জিনিয়ে ধরলাম না, কিন্তু মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, সলীল হবে আমার সারা জীবনের প্রাপ্তের বক্তু। যেরকম বন্ধুর জন্যে মানুষ আন দিয়ে দেয় সেরকম বক্তু।

সলীলের হাতে একটা ঠোঁঢা, আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, নে খা।
কি?

তোর ভান্যে পরটা মাংস এনেছি!

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, সত্ত্ব? খোদার কসম?

ধূর গাথা, এইভান্যে আবার খোদার কসম বলতে হয়?

আমি তাড়াতাড়ি ঠোঁঢাটা খূলে দেবি সত্ত্বাই খবরের কাগজে ঘোড়া বড় বড় দুইটা পরটা ভিতরে মাংস দিয়ে প্যাচিয়ে এনেছে। আরেকটা ছোট ঠোঁঢায় দুইটা লাজু। সাথে বড় বড় দুইটা কলা। আবারগুলি দেবে আবার একেবারে জিবে পানি এসে গেল।

সলীল বলল, আমি বুঁকেছিলাম তোর নিশ্চয়ই খাওয়া হয়নি। সুবলের রেস্টুরেন্ট থেকে কিনে এনেছি। দ্যাখ দেয়ে, মনে হয় এখনো গবর আছে।

কেন জানি হঠাৎ আমার চোখে পানি এসে গেল। খুব সাবধানে আমি চোখের পানি ঘূছে ফেললাম। সলীল না দেখার ভান করে দূরে তাকিয়ে রইল।

আমি খেতে খেতে জিঞ্জেস করলাম, তুই কেমন করে খবর পেলি?

এরকম থবর কি চাপা থাকে নাকি? তুই রাগ করে বাসা থেকে পালিয়ে গেছিস, লোকজন সেটা জানবে না? আমি গিয়েছিলাম তোদের বাসায়।

সত্যি? গিয়েছিলি?

হ্যা।

কি দেখলি?

মাসীমা খুব কামাকাটি করছেন।

আর লাবলু? ঘৰ কমেছে?

ঘৰ ছিল নাকি? দেখে তো মনে হল না। লাবলু কৰ্দাছে না তবে খুব গাঁথীৰ।

আমি বাবাৰ কথা জিজ্ঞেস কৰলাম না, সলীল নিজেই বলল, তোৱ বাবা খালি লাক খাপ দিয়ে বেড়াচ্ছেন।

তাই?

হ্যা। বলছেন দুইদিন যখন না খেজে থাকবি তাৰপৰেই নাকি সুড়সুড় করে ফেরৎ যাবি।

তাই বলছেন?

হ্যা। সলীল মাথা নাড়ল, তুই যখন হিয়ে থাবি তখন নাকি তোকে আছ্যামত খোলাই দেওয়া হবে।

আমি আৰ নিষ্ঠু বললাম না।

সলীলৰ সাথে আৰো নানাবৰ্কম কথা হল, আমি তাকে শিঃ মাছের হাই খাওয়াৰ কথা বললাম, তাৰ বিচিত্ৰ চিকিৎসাৰ কথা শুনে সে হেসেই ধাচে না। ভাঙল চৌধুৰী কোথায় যেতে পাৱেন সেটা নিয়েও কথা হল। রাত্রে কেমন ঘূৰ হয়েছে, একা একা ভয় পেয়েছি কিনা সলীল সেগুলিৰ খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইল। সকো হয়ে এলে যখন সলীলৰ বাসায় চলে যাবাৰ সময় হল, হঠাৎ করে সে বলল, তোদেৱ বাসাৰ কাছে আৰো একজন পালিয়ে গৈছে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কে?

তোদেৱ বাঢ়িওয়ালা উকিল সাহেবেৰ বাসাৰ গৰু রাখে যে হেসেটা—

জয়নাল?

হ্যা, জয়নাল।

জয়নালৰ কি হয়েছে?

বাসা থেকে পালিয়ে গৈছে। গৰু বাছুৰ ছেড়ে দিয়েছে, সেই গৰু বাছুৰ নাকি ঘূৰে বেড়াচ্ছে, জয়নালৰ দেখা নেই।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, হতেই পাৱে না।

হতে পাৱে। সলীল হাসাৰ মত ভঙ্গি করে বলল, আমি নিজেৰ চোখে দেখেছি। তোদেৱ উকিল সাহেব এই এত বড় একটা লাঠি নিয়ে দাঢ়িয়ে আছেন। জয়নালকে ধৰে আলা হলেই এক ঘা দৰে মাথা দুইভাগ করে দেবেন।

আমি অবাক হয়ে বসে রইলাম। মাত্ৰ পেদিন আমি জয়নালৰ চিঠি লিখে দিয়েছি। লম্পা চিঠি। সেখানে কাৰ ছেড়ে দেওয়াৰ কোন উল্লেখ নেই। হঠাৎ করে আমাৰ একটা কথা মনে হল। আমি চমকে উঠে বললাম, সৰ্বনাশ!

সলীল অবাক হয়ে বলল, কি হয়েছে?

নাওয়াজ খান!

নাওয়াজ খান কি?

নাওয়াজ খান নিষ্ঠয়ই জয়নালকে আটিকে বেঁচেছে। নিষ্ঠয়ই খুন করে ফেলবে। কি বলিস তুই?

হ্যা। তাৰ আৱেক বশু ছিল যে নাওয়াজ খানেৰ কাছে যেতো, কৰদিন আগে খুন হয়েছে, মনে নেই?

হ্যা, তুই বলেছিলি।

আৱো অন্যেৱা নিৰ্বোধ হয়ে গৈছে, কোন ঘোঞ নেই। এখন জয়নালৰ কোন ঘোঞ নেই। তুই বুবতে পাৰছিস না?

সলীল খুব বুঁচকে বলল, তুই বলছিস জয়নাল খুন হয়ে গৈছে?

আজাহ না কৰক। কিন্তু—

কিন্তু কি?

জয়নালকে আমি চিনি, সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে সে কোনদিন বাসা থেকে পালাবে না। নিষ্ঠয়ই তাৰ কোন বিপদ হয়েছে। নিষ্ঠয়ই—

সলীল যুখ সূচালো করে আমাৰ দিকে তাকিয়ে বলল, তুই চিকই বলেছিস। নাওয়াজ খান খুব ডেঞ্জৰাস যানুৰ।

কি কৰা যাব বল তো?

সলীল খানিকক্ষণ আমাৰ দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদেৱ বেতে হবে তাকে ধীচানোৰ ঘন্টে।

আমৰা?

হ্যা, কড়িকে বলে লাভ নেই, কেউ আমাদেৱ কথা বিশ্঵াস কৰবে না।

চিকই বলেছিস। আমি মাথা নেড়ে বললাম, চল যাই তাহলে। দেৱি হলে সৰ্বনাশ হয়ে যাবে।

ঠিক রওনা দেওয়াৰ আগে সলীল বলল, চল ভাঙল চৌধুৰীকে একটা চিঠি লিখে যাই, কোথায় যাচ্ছি কেন যাচ্ছি বলে। আমাদেৱ যদি কিছু একটা হয় তাহলে অন্ততঃ কেউ একজন জানবে।

সলীল খুব সুন্দৰ বাল্লা লিখতে পাৱে, খুব গুছিয়ে একটা চিঠি লিখে ফেলল। চিঠিটা তাৰ দৰজায় লাগিয়ে আমৰা বেৱ হয়ে গৈলাম। বাহিৰে তখন অন্ধকাৰ নেমে আসছে।

১২. গ্রীন মেডিকেল ক্লিনিক

আবার যখন গ্রীন মেডিকেল ক্লিনিকের বাইরে এসে দাঢ়িয়েছি তখন টিপ টিপ করে ঘৃষ্টি পড়ছে। অঙ্ককার হয়ে এসেছে, রাস্তাটো মানুষ বেশি নেই। আমরা দোতালা দালানটার দিকে তাকালাম, উপরে দুটি ঘরে বাতি ঝলঙ্গে, এ ছাড়া পূরো ক্লিনিকটা অঙ্ককার। সামনে কড় গেটো বন্ধ, আমরা তবু সাবধানে একটু ধাক্কা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম। হেঠে হেঠে আমরা ক্লিনিকের পিছনে গেলাম, সেটাও দেওয়াল দিয়ে দেরা। পিছনেও একটা ছেট কাটের গেট, সেই গেটটাও বন্ধ। আমরা দেওয়ালের উপর দিয়ে ভিতরে তাকালাম। কোন মানুষজন নেই, দেখে দেখে হয় এখনে কোন মানুষজন থাকে না। আমি গলা নামিয়ে বললাম, ভিতরে ঢুকতে হবে আমাদের।

কেমন করে চূক্ষি?

দেওয়াল টিপকে।

যদি ধরা পড়ে যাই?

কান কাছে ধরা পড়বি? কাউকে তো দেখি না।

তা ঠিক।

এদিক সেদিক তাকিয়ে আমার দুইজন সাবধানে দেওয়াল বেয়ে উঠে ভিতরে লাফিয়ে পড়লাম। তাড়াতড়ে করে ঢুকতে গিয়ে পেটের খানিকটা ছাল উঠে গেল কিন্তু এখন সেটা নিয়ে যাখা যাবানোর সব্য নেই। চোর যখন কোথাও চুরি করতে আসে, প্রথমেই নাকি পালিয়ে যাওয়ার রাস্তাটা ঠিক করতে গিয়ে দেখি, কাটের ছেট গেটিটাতে একটা ছেট তালা লাগানো। দোড়ে যদি পালাতে হয় কাজটা খুব সহজ হবে না। আপাততও চিন্তাটা যাথা থেকে সরিয়ে দিলাম, এখন যামাখা এটা নিয়ে চিন্তা করে কি লাভ?

আমরা খুব সাবধানে গুড়ি মেরে দোতলা বাসতির কাছে এগাম। পেছনে একটা দরজা, আন্তে করে ধাক্কা দিয়ে দেখি ভিতর থেকে বন্ধ। সামনেও একটা দরজা, সেটাও নিশ্চয়ই বন্ধ। আমরা তবু সাবধানে পরীক্ষা করে দেখলাম। আমরা উপরের দিকে তাকালাম, উপরে কয়েকটা জানালা রয়েছে কিন্তু প্রত্যেকটা জানালাটোই লোহার শিক লাগানো। পালিব পাইপ 'বেয়ে একটা কানিশে গো যায় কিন্তু সেখান থেকে অন্য কোথাও যাবার সহজ কোন উপায় নেই। আমরা দুজন দেয়াল দ্বেষে দাঢ়িয়ে ঘৃষ্টি থেকে নিজেদের বাচিয়ে নানা রকম পরিকল্পনা করতে থাকি। অনেক ভেবে ভিজে যে পরিকল্পনাটা দ্বাড়া করালাম সেটা ভয়ংকর বিপজ্জনক, কিন্তু মনে হল এটা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। দুজনে মিলে পরিকল্পনাটা বেশ কয়েকবার যাচাই করে দেখলাম। যদি কোন ঘোলমাল হয়ে যায় তখন কি করতে হবে সেটাও মোটামুটি ঠিক করে নেরা হল। পরিকল্পনায় একজন দরজাটি ঘোলার ব্যবস্থা করাবে, অন্যজন গোপনে ভিতরে



চূক থাবে। যে দরজাটা খোলাৰ ব্যবস্থা কৰবে তাৰ ছোটাছুটি কৰতে হবে বলে সেটা সলীলকে দেয়া হল। শিং মাছেৰ ধাই দেয়ে এখনো বুড়ো আঙুলটা টন টন কৰছে, যদি ঢানা হ্যাচড়া কৰে দেওয়াল দেয়ে উঠতে হয়, সলীল সেটা আমাৰ থেকে ভাল কৰতে পাৰবে।

আমি দৱজাৰ কাছাকাছি একটা ঘোপেৰ নিচে লুকিয়ে গেলাম। সলীল বড় বড় কয়টা ঢেলা দিয়ে কাঠেৰ গেটেটাৰ উপৰে পা ঝুলিয়ে বসে, একটা দৱজায় ছুড়ে যাবল বেশ শব্দ কৰেই। সাথে সাথে ভিতৰ থেকে নাওয়াজ খানেৰ ডাইভাৰেৰ গলা শুনতে পেলাম, চিৎকাৰ দিয়ে বলল, কে?

সলীল গেটেৰ উপৰে বসে বলল, আমি।

আমি কে?

সলীল উত্তৰ না দিয়ে আৱেকটা চিল ছুড়ে যাবল দৱজায়।

ওসমান সাথে সাথে দৱজা খুলে যাবা বেৰ কৰে ধমক দিয়ে বলল, কে দৱজায় শব্দ কৰছে? কে?

বাইদে অঞ্জকাৰ লেমে এসেছে, তাৰ উপৰ চিপটিপ কৰে বৃটি পড়ছে। সলীল যে গেটেৰ উপৰে বাস আছে ভাল কৰে দেখা যাচ্ছ না। সে গেটেৰ উপৰ থেকে চিৎকাৰ কৰে বলল, আমি! এই যে আমি! এইখানে।

ওসমান যতটুকু রেগে উঠল মনে হল তাৰ থেকেও বেশি অধাৰ হল। দৱজা খুলে বাইদে এসে বলল, পাঞ্জী ছেলে। দৱজায় চিল ছুড়ছ কেন?

সলীল গেটেৰ উপৰ থেকে বলল, হাতেৰ ব্যায়াম কৰছি। চিল ছোঁড়া হাতেৰ শুব ভাল ব্যায়াম, জানেন তো।

কি বললি? কি বলছিস তুই বদমাইশ?

তুই তোকাৰি কৰছেন কেন? আমি কি আপনাৰ চামীতে চিল মেৰেছি? হ্যাঁ?

ওসমান কহেক পা এগিয়ে দিয়ে বলল, ভাগ এখান থেকে। ভাগ।

সলীল একটা চিল হাতে দিয়ে বলল, আপনাৰ কি ঘনে হয়, এখান থেকে চিল ছুড়ে কি দোতলাৰ জানালাৰ কাঁচটা ভাঙতে পাৰব?

কি? কি বললি?

মনে হয় পাৰব। এই দেখেন—ওসমান কিষু বলাৰ আগেই জানালাৰ দিকে একটা বড় চিল ছুড়ে দেয়। অল্পেৰ জন্মে সেটা কাঁচে না লেগে কানিশে লেগে টুকৰো টুকৰো হয়ে গেল।

ওসমান নিহেৰ চোখকে বিশ্বাস কৰতে পাৰল না। সলীল তখন আৱেকটা চিল হাতে নিয়েছে, সেটা জানালাৰ দিকে নিশ্চান্ত কৰে বলল, এইটা নিশ্চয়ই পাৰব! ঘোন টু—

সলীল চিলটা ছোঁড়াৰ আগেই ওসমান রেগে আগুন হয়ে গেটেৰ দিকে ছুটি যেতে থাকে। আমি ঠিক এই সুযোগেৰ জন্মে আপেক্ষা কৰছিলাম, খোলা দৱজা দিয়ে হট

কৰে ভিতৰে চুকে গেলাম। এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখি একটা হেট টেবিল। টেবিলকু দিয়ে ঢাকা। আমি দোড়ে সেই টেবিলেৰ নিচে লুকিয়ে গেলাম।

বাইদে কি হচ্ছে বুঝতে পাৰছিলাম না। সলীল নিশ্চয়ই লাকিয়ে গেট থেকে লেমে থাবে, তাকে কথনোই ধৰতে পাৰবে না। যতক্ষণ পাৱা যাব ওসমানকে বাইদে ব্যন্তি রাখাৰ কথা। মনে হয় সলীল সেটাই চেষ্টা কৰছে। সলীল কিছু একটা বলতে এবং ওসমান প্ৰচণ্ড গালি-গালাজ কৰছে শুনতে পেলাম। পৰিকল্পনাৰ প্ৰথম অংশটা মনে হয় ভালভাৰেই কাজ কৰেছে।

আমি টেবিলেৰ নিচে নিশ্চাস বজ কৰে বসে আছি এৰ যাকে একটু পৰে শুনতে পেলাম ওসমান ভিতৰে চুকে দৱজা বজ কৰল, তাৰপৰ গজগজ কৰে কি একটা বলতে বলতে উপৰে উঠে গেল। উপৰ থেকে ভাৱি গলায় নাওয়াজ খান জিজেস কৰলেন, কি হয়েছে ওসমান?

আৱ বলবেন না স্যাৰ! এক বদমাইশ ছেলে আমাখা গেটেৰ উপৰে বসে চিল ছুড়ছে!

অ্যাম! নাওয়াজ খান অবাক হয়ে বলল, কেন? চিল ছুড়ছে কেন?

বদমাইশী স্যাৰ। পোলাপান যে কি বদমাইশ হয় আপনি জানেন না স্যাৰ।

জানি। আমি জানি। কিষু এইটা কি বদমাইশী না অন্য কিষু?

অন্য কিছু কি?

নাওয়াজ খান ভাৱি গলায় বললেন, কোন কিষু সন্দেহ কৰছে না তো কেউ? কি সন্দেহ কৰবে স্যাৰ?

আমাদেৱ কিডনি ট্রান্সপ্রুটেৰ প্ৰজেক্ট?

আৱে না স্যাৰ! আপনি কি বলছেন! কোনদিনও না।

হঠাৎ কৰে পুৱো ব্যাপৱটা আমাৰ কাছে পৰিষ্কাৰ হয়ে যাব। সাথে সাথে প্ৰচণ্ড আতংকে আমাদেৱ সাৱা শৰীৰ কাঁচা দিয়ে উঠে। আমাৰা যোটা সন্দেহ কৰেছি সেটা সত্যি।

গৱিব বাকাদেৱ নিয়ে নাওয়াজ খান কি কৰছে বুঝতে পাৰিনি, এখন বুঝতে পাৰিলাম। তাদেৱ মেৰে শৰীৰ থেকে কিডনিটা কেটে দেয়। অসুখ-বিসুখে মানুষৰ কিডনি নষ্ট হয়ে যাব, তখন অন্যেৰ কিডনি লাগানো যাব। গৱিব বাকাদেৱ কিডনি কেটে নিয়ে এৱা বিজি কৰে। কি সৰ্বনাশা ব্যাপৱ! রশীদকে নিশ্চয়ই এভাৱে মেৰেছে। জয়নালকেও এভাৱে যাববে। নাকি এৰ যাকে মেৰে হেলেছে। এক ভয়ংকৰ ভয়ে আবাৰ আমাৰ সাৱা শৰীৰ কেপে উঠে।

আমি শুব সাবধানে টেবিলেৰ নিচে থেকে বেৰ হয়ে পিছনেৰ দৱজাটি খুলে দিলাম। সলীলেৰ একটু পৰে ভিতৰে এসে জোকাৰ কথা। ভিতৰে একজন না হয়ে দুজন হলে অনেক সুবিধে। আমি একবাৰ ভাকলাম, যৌকু জনবাৰ জেনে পেছি, এখন বেৰ হয়ে যাই, কিষু জয়নালেৰ কথা মনে পড়ল। বেচাৱা কি অবস্থায় আছে না জেনে কেমন

করে যাই ? সলীলের জন্যে অপেক্ষা না করে আমি খুব সাবধানে নিচের তলাটি ধূরে
ধূরে দেখতে লাগলাম। অঙ্ককার ঘর, খুব স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না, কিন্তু মনে হল দেখার
মত বিশেষ কিছু নেই। সোফা, চেয়ার টেবিল, শেলফ এই ধরনের জিনিসপত্রই বেশি।
জয়নালের কোন চিহ্ন নেই। তাকে মনে হয় দোতলাতে অটিকে রেখেছে।

মখন শুনলাম উপরে দুইজন আবার কথা বলতে শুনু করেছে, আমি তখন খুব
সাবধানে সিডি দিয়ে উপরে উঠে গেলাম। উপরে অনেকগুলি ঘর, যেই ঘরে নাওয়াজ
খান ওসমানের সাথে কথা বলছে খুব সাবধানে সেই ঘরটা এড়িয়ে আমি অন্য ঘরগুলিতে
উকি দিতে থাকি। প্রথম দুটি ঘরে অনেকগুলি বিছানা সাজানো, হাসপাতালে যেরকম
থাকে। তিন নম্বর ঘরটা অঙ্ককার মনে হল। ভিতরে নানাবক্র ডাক্তারি যন্ত্রপাতি। চার
নম্বর ঘরটার দরজা বন্ধ, জানালা দিয়ে উকি দিয়ে দেখি, ভিতরে আবছা অঙ্ককার। মনে
হল একটা বিছানা কিন্তু বিছানাটি খালি, দেখানে কেউ নেই। আমি পরের ঘরটি দেখার
জন্য সরে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে হল দেখেতে কেউ যেন শুয়ে আছে। ভাল করে
তাকিয়ে দেখি, সত্যি তাই। আবছা অঙ্ককার, ভাল করে দেখা যায় না, কিন্তু যানুষটি
ছেটি, নিচরই জয়নাল হবে। যদে গেছে কিনা বুঝতে পারচ্ছিলাম না, তাই অনেকক্ষণ
তাকিয়ে রইলাম। মনে হল এক সহয় একটু নড়ে উঠল, তার মানে এখনো বেঁচে আছে।
ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু মনে হল হাত দুটি পিছনে বাঁধা, মুখটিও কাপড় দিয়ে
অটিকানো, যেন কোন রকম শব্দ করতে না পারে। বেচারা জয়নাল ! না জানি কতকগ
থেকে তাকে এভাবে বেঁধে ফেলে রেখেছে।

আমি সাবধানে উঠতে যাচ্ছিলাম, ঠিক তখন কে যেন আবার থাঢ়ে হাত রাখল।
আমি চমকে উঠলাম, ভয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠেছিলাম, অনেক কটে নিজেকে শাস্ত
করে যাবা ধূরিয়ে দেখি, সলীল। আমি বুকে হাত দিয়ে ফিসফিস করে বললাম, সলীল
তুই !

ইয়া। সলীল গলা নামিয়ে বলল, জয়নালকে পেয়েছিস ?

ইয়া। তুই দেখ ।

সলীল জানালা দিয়ে উকি দিয়ে আনিবক্র দেখে বলল, বেঁধে রেখেছে ?

ইয়া। বুর্বও বাঁধা ।

কি সর্বনাশ ! এখন কি করবি ?

বাইরে গিয়ে খবর দিতে হবে। এরা বাচাদের কিডনি কেটে বিক্রি করে।

তুই কেমন করে জানিস ?

আমি এদের কথা বলতে শুনেছি।

সর্বনাশ !

ইয়া। চল যাই এখন।

আবাদের কথা যদি কেউ বিশ্বাস না করে ?

আমার এই কথাটা আগে মনে হয়নি, সত্যি তো, আমরা বাইরে গিয়ে কাকে

বলব ? পুলিশকে ? পুলিশ যদি আবাদের ধর্মক দিয়ে বের করে দেয় তখন ? ততক্ষণে
যদি জয়নালকে যেরে ফেলে ?

সলীল ফিসফিস করে বলল, জয়নালকে ছুটিয়ে নিতে হবে। তারপর এক সাথে
তিনজন পালাব।

ইয়া। আমি মাথা নাড়লাম। জয়নালকে নিয়ে পালাতে হবে।

আমি ভিতরে যাই, তুই বাইরে থাক।

উহ ! আমি মাথা নাড়লাম, জয়নাল তোকে ঢিনে না, গোলমাল করতে পারে।
আমি যাই।

একটু ভেবে সলীল থার্জ হল। কলল, ঠিক আছে, তুই যা। সাবধানে।

সলীল দেখানে দীর্ঘিয়ে রইল, আমি পা চিপে চিপে এগিয়ে গেলাম। ভারি একটা
দরজা, তার মাঝে শক্ত লোহার ছিটকিনি লাগানো। আমি খুব সাবধানে কোন শব্দ না
করে সেই ছিটকিনি খোলার চেষ্টা করলাম, তবু খুট করে একটা শব্দ হয়ে গেল। আমি
ভয়ে একেবারে সিটিয়ে গেলাম, কিন্তু কপাল ভাল, নাওয়াজ খান বা ওসমান ঘর থেকে
বের হল না; আমি শেষ পর্যন্ত ছিটকিনিটা খুলতে পারলাম। খুব সাবধানে দরজা খুলে
ভিতরে ঢুকতেই জয়নাল ভয় পেয়ে হঠাৎ গো গো শব্দ করে হাত পা ছুড়ে ছটফট করে
উঠল।

আমি ছুট জয়নালের কাছে গিয়ে কানের কাছে ফিসফিস করে বললাম, চুপ
জয়নাল ! শব্দ করিস না। আমি মূনীর।

জয়নাল সাথে সাথে চুপ করে যায় কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। আমি শুনতে
পেলাম পাশের ঘর থেকে ওসমান আর নাওয়াজ আন ছুটে বের হয়ে আসছে। বাইরে
একটা আলো আলে উঠল, সাথে সাথে সলীলের পাশের শব্দ শুনতে পেলাম। দৌড়ে
পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। নাওয়াজ খান আর ওসমান “ধর ধর” চিৎকার করে তার
পিছু পিছু ছুটতে থাকে। আমি কি করব বুঝতে না পেরে তাড়াতাড়ি বিছানার নিচে
লুকিয়ে গেলাম।

সলীল পালিয়ে যেতে পেরেছে কিনা জানি না, দুই দুইজন বড় যানুমের সাথে কি
সে দৌড়ে পারবে ? পিছনের গেটিটা খোলা থাকলে তবু একটা কথা ছিল। আমি
প্রাণপণে খোদাকে ডাকতে থাকি—হে খোদা ! সলীল হেন পালিয়ে যেতে পারে। তাকে
হেন বদমাইশগুলি ধরতে না পারে। কিছুতেই যেন ধরতে না পারে—

একটু পরেই বুঝতে পারলাম, খোদা আমার দোয়া শুনেনি। আমি ওসমানের গলা
শুনতে পেলাম, চাপা স্বরে বলছে, বদমাইশ ছেলে, এইবার আমি তোকে পেয়েছি, দেখ
তোর আমি কি অবস্থা করি।

আমি সলীলের গলার স্বর শুনতে পারলাম, ছেড়ে দাও আমাকে, বদমাইশ।

চৰণ আংতকে আমার সারা শরীর কেমন যেন অবশ হয়ে আসে। হে খোদা, এটা
ভূমি কি করলে ? এখন কি হবে ?

১৩. মুখোমুখি

সলীলকে ধরে নাওয়াজ খান আর ওসমান পাশের ঘরে নিয়ে গেল। সলীলকে কি করছে আমি জানি না কিন্তু শব্দ শুনে মনে হল দুই একটা ঝুঁতি কিল মেরে বসেছে। নাওয়াজ খান হাঁথ বলল, ওসমান, থাম দেখি।

বদমাইশটাকে জানে মেরে ফেলব। আমার সাথে ফাঙ্গলেমি।

ঠিক আছে, যখন সময় হবে মেরো, এখন আমাকে একটু কথা বলতে দাও। এই ছেলে, তুমি এখানে এলে কেন?

সলীল কোন কথা বলল না।

তোমাকে আমি আগে দেখেছি। কয়দিন আগে এসেছিলে আমার সাথে দেখা করতে। সাথে আরেকজন ছিল তোমার। ওসমান বলেছে একটু আগে তুমি দরজায় চিল ছুকেছ। এখন তুমি ভিতরে ছুকেছ। ব্যাপারটা কি?

সলীল তখনো কোন কথা বলল না।

কথা বল ছেলে। না হলে তোমার ঝুঁতি বড় বিপদ হতে পারে।

সলীল মনুষের জিজেস করল, কি বিপদ?

আমার মনে হয় না তুমি সেটা শুনতে চাও। আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তুমি এখানে কেন এসেছ?

সলীল কোন কথা বলল না।

তুমি কি একা এসেছ না সাথে আর কেউ ছিল?

আমি এক।

তোমার সেই বক্ষ কোথায়?

বাহিরে।

বাহিরে কেন?

আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি যদি ভিতরে আটকা পড়ি, সে খবর দেবে।

কোথায় খবর দেবে?

আমি বলতে চাই না।

কেন বলতে চাও না?

সলীল কোন কথা বলল না।

নাওয়াজ খান ধর্মক দিয়ে বলল, সত্যি করে বল তোমার সেই বক্ষ কোথায়?

বাহিরে। আমরা এত বোকা না যে মুইজন একসাথে চুকব। একজন ভিতরে, আরেকজন বাহিরে।

হ্যাম ! নাওয়াজ খান অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ভিতরে ছুকেছ কেমন করে?

বুঁকি আঠিয়ে। আমি যখন আপনার ড্রাইভারকে বাগানের চেষ্টা করছিলাম তখন

নে চুকে গেছে। তারপর দরজা খুলে দিয়েছে, তখন আমি ছুকেছি। সে এখন বাহিরে অপেক্ষা করছে।

আমার কি মনে হয় জান?

কি? সে ভিতরে কেথাও আছে। ঝুঁজলেই পাওয়া যাবে।

ঝুঁজেন তাহলে। সলীল খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমরা এত বোকা না।

তোমরা বোকা না?

না।

তার মানে তোমরা অনেক কিছু জান?

সলীল চুপ করে রইল।

তোমরা জয়নালের কথা জান?

জানি।

কেমন করে জান? তার সাথে তো তোমাদের বক্ষু ইওয়ার কথা না।

জয়নাল আমার বক্ষুর পাশের বাসায় কাজ করে। আমার বক্ষু তার চিটিপত্র লিখে দেয়। সেই জন্যে তার সাথে পরিচয়।

তুমি জয়নালকে চেনে না?

না।

নাওয়াজ খান মনে হল একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেললেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তুমি একটু আগে বলেছ যে তুমি বোকা না। আসলে সেটা সত্যি না। আনলে তুমি বোকা। অসন্তুষ্ট বোকা। মানুষ বোকা না হলে একজন মানুষ যাকে চিনে না তার জন্যে নিজের জীবন শেষ করে না। তুমি শেষ করেছ। জয়নালকে কেন এনেছি তুমি মনে হয় জান। সেটা যারা জানে তাদের নিয়ে আমি কোন ঝুঁকি নেই না।

আমার বক্ষু একক্ষণে পুলিশের কাছে চলে গেছে। এক্সুনি পুলিশ আসবে।

আমার মনে হয় তুমি মিথ্যা কথা বলছ। তোমাদের মাঝে কোন বড় মানুষ নেই। তোমরা ছেট বাক্সারা অনেক বড় ব্যাপারে নাক গলিয়েছ। সেটার ফল তোমরা পাবে—
আমার বক্ষু—

তোমার কোন বক্ষু নেই। যদি থেকেও থাকে, তার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। বিশেষ করে যদি আমার বিশুক্তে বলে। তাও একক্ষণ উল্লেখ একটা গল্প। কিন্তু আমি তুম কোন ঝুঁকি নেব না। সত্যিই যদি তোমার বক্ষু পুলিশের কাছে যেয়ে থাকে, সত্যিই যদি পুলিশ তার কথা বিশ্বাস করে এখানে আসে, তার জন্যে একটু সময় দরকার। কম করে হলেও এক ঘণ্টা। আমি আধ ঘণ্টার যাবে সব কাজ শেষ করে ফেলব।

কি কাজ?

সেটা জানতে চেয়ে না ছেলে। তোমার শুনতে ভাল লাগবে না। মেরে ফেলার কথা শুনতে কারো ভাল লাগবে না।

সলীল কি একটা বলতে যাচ্ছিল, নাওয়াজ খান তাকে থারিয়ে দিয়ে বললেন,

ওসমান।

ঝী।

এই পুরো আফেলাটি হল তোমার বোকায়ির জন্যে। যদি এই ছেলেটা ভিতরে না ঢুকতে পারত এই কাফেলাটা হত না।

আমি দুঃখ নাই স্যার। আমি মনে করেছি—

থাক। আমাদের হাতে সময় নেই। খুব তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে হবে। দুইটা কূলার রেতি কর।

দুইটা?

ইয়া। একটাতে জয়নালের কিউনি, আরেকটা বোনাস, এই অব্যাহোটি ছেলের কিউনি। আর দুইটা বড় প্লাষ্টিকের ব্যাগ বের কর। এদের ভেড়বড়ি মনে হয় সাথে নিয়ে দেতে হবে। সত্যিই যদি পুলিশে খবর দিয়ে থাকে, কোন প্রয়াণ রাখা ঠিক হবে না। আমি অপারেশান থিয়েটার রেতি করছি, তুমি মাইক্রোবাস্টাও রেতি কর। আর ঘটার মাঝে সব কাজ শেষ করে আমরা রওনা দেব।

ঠিক আছে স্যার। আর এই ছেলেটা?

এখন বেঁধে রাখ। মুখে সার্জিক্যাল টেপ লাগিয়ে দাও যেন শব্দ করতে না পারে।

সলীল আবার কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল কিন্তু মনে হয় বলতে পারল না। খানিকক্ষণ ধন্তাধন্তির মত শব্দ হল, তারপর এক সময় আমাদের এই ঘরটাতে সলীলকে ফেলে দিয়ে বাইরে থেকে সরজা বন্ধ করে চলে গেল।

নাওয়াজ খান আর ওসমানের পায়ের শব্দ মিলিয়ে দেতেই আমি বিছানার নিচ থেকে বের হয়ে সলীলের কাছে থিয়ে ফিসফিস করে বললাম, সলীল!

সলীল কোন শব্দ করতে পারল না, মুখ লিয়ে কেবল জ্বালি দে দে করে শব্দ করল। আমি তার মুখের টেপটা খুলে দিতেই সে ফিসফিস করে কল্প, মুন্টি, হঁহ এখানে কি করিস? পালিয়ে গেলি না কেন?

একা একা কোথায় যাব! কি করব? কেউ কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?

তাহলে?

দাঢ়া, আগে তোমের তাড়াতাড়ি খুলে দিই। মাথা ঠাণ্ডা রাখ। আমার তিনজন, তারা দুইজন, আর কিছু যদি না হয় গায়ের জোরে বের হয়ে যাব।

শুব শঙ্ক করে দেখেছে। অঙ্ককারে হাতড়ে হাতড়ে হাতের ধানেন খুলতে অনেকক্ষণ সময় লাগল। বাইরে নিচে নাওয়াজ খান আর ওসমানের নানারকম কাজকর্মের শব্দ পাইলাম। শুধু তার হচ্ছিল, ওদেরকে খুলে দেয়ার আগেই না চলে আসে। কিন্তু এল না। আমি প্রথমে সলীলের এবং পরে সলীল আর আমি মিলে জয়নালের ধানেন খুলে দিলাম।

জয়নাল তার কঙ্গিতে হাত কূলাতে কূলাতে বলল, তবেরের বাচ্চাদের জান যদি আমি শেষ না করি।

আমি বললাম, আস্তে জয়নাল, আস্তে—

জয়নাল হিসহিস করে বলল, গলা ছিড়ে ফেলব আমি। কলজে টেনে বের করে ফেলব।

আমি আবার বললাম, আস্তে জয়নাল! আস্তে।

জিব টেনে ছিড়ে ফেলব। জন্মের মত লুলা করে দেব।

মাথা গরম করিস না জয়নাল, খুব ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে। যখন ওরা চুকবে তখন তোরা মেঝেতে শুয়ে থাকিস মুখে টেপ লাগিয়ে, যেন বুঝতে না পাবে তোদের হাত খোলা। তারপর যেই কাছে আসবে—

লাফিয়ে পড়ব! জয়নাল দ্বাত কিড়মিড় করে বলল, গলা ছিড়ে ফেলব।

সলীল একটু ইতঃস্মত করে বলল, খালি হ্যাতে? একটা লাঠিসোটা পেলে হত।

আমরা ঘরে খোজাখুজি করতে থাকি, লাঠি জাতীয় কিছু পাওয়া গেল না। পাশে একটা ছেঁট বাথকুম আছে, সেখানে কয়েকটা বোতল পাওয়া গেল। দড়ি দিয়ে সেগুলো দেখে দেয়া হল। পুরিয়ে যদি ঠিকমত মারা যায় একজনকে ঘায়েল করতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা না।

সলীল আবার বলল, একটা সিগন্যাল দিতে পারলে হত, ঠিক তখন লাফিয়ে পড়তাম।

আমি বললাম, এক কাজ করলে কি হয়?

কি কাজ?

বাথকুমে একটা লাইট সুইচ আছে।

ইয়া। সলীল ঠিক বুঝতে পারল না, জিজেস করল, লাইট সুইচ দিয়ে কি হবে?

যদি লাইট বাল্টা খুলতে পারি তাহলে সেটার পিছনে একটা পঞ্চস দিয়ে বাল্টা আবার লাগিয়ে দিতে পারি। তারপর যেই সুইচ অন করা হবে, ফিউজ কেটে পুরো বাসা অক্ষকার হয়ে যাবে। তারা একেবারে কিছু বুঝতে পারবে না — তোরা তখন অক্ষকারে লাফিয়ে উঠে —

সলীল হাতে কিল দিয়ে বলল, ভেরী গুড়।

বাথকুমের লাইট বাল্টা খোলা খুব সহজ হল না। প্রথমে এক মুহূর্তের জন্যে জ্বালিয়ে দেখে নিলাম সেটা কোথায়, তারপর অঙ্ককারে হাতড়ে হাতড়ে সেটা খুলে ফেললাম। তার জন্যে খুব সাবধানে বেসিনের উপর দাঢ়াতে হল। শুধু মনে হচ্ছিল সবকিছু ভেঙে বুঝি হতভুক করে নিচে পড়ব। বাল্টের পিছনে পঞ্চস দেয়ার পর বাল্টা আবার লাগাতে খুব কষ্ট হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা লাগিয়ে ফেললাম। আমাদের প্রস্তুতি এখন শেষ।

সলীল আর জয়নাল তাদের মুখ সার্জিক্যাল টেপটা লাগায়ে নিয়ে হাত পিছনে করে শুয়ে রইল। দেখে মনে হয় তাদের হাত পিছয়োড়া করে থাকা। তাদের হাতে দড়ির এক মাথা, অন্য মাথায় একটা বোতল। পুরিয়ে ঠিকমত মারলে সেটা রাতিমত

একটা ভয়ঙ্কর অস্ত্র। আমি বাখরমে লাইটের সুইচটায় হাত দিয়ে বসে রইলাম। সুইচটা অন করতেই লাইট বাল্টের পিছনে রাখা পরস্তি শর্ট সার্কিট করে মেইন সুইচ ফিউজ কেটে দেবে। ঘৃত্যুট অঙ্ককার হয়ে যাবে তখন ঘরটা।

আমরা তিনজন চূপচাপ অপেক্ষা করছি। বুকের ভিতরে এক বরনের ধূকপুরুণ। সব কিছু ভালয় ভালয় কাজ করবে তো? সত্যি আমরা পালাতে পারব তো? এবা ভয়ঙ্কর মানুষ, যদি পালাতে না পারি আমাদের জানে দেবে ফেলবে। যেভাবে হোক আমাদের পালাতে হবে। যেভাবেই হ্যেক।

ঠিক এই সময় আমরা দিঙ্গিতে প্যায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। নাওয়াজ খান আর ওসমান কথা বলতে বলতে এসে ছিটকিনি খুলে ঘরে এসে তুকে বাতি ঝালালো। আমি দরজার ফাঁক দিয়ে দেখছি, দুইজন সাকামাকি এসে দাঁড়িয়েছে। ওসমান জিজ্ঞেস করল, প্রথমে কোনটাকে?

নাওয়াজ খান কিছু একটা বলতে যাছিলেন, ঠিক তখন আমি বাখরমের সুইচটা অন করে দিলাম, কোথায় জানি ভট্ট করে একটা শব্দ হল আর সাথে সাথে সমস্ত হর অঙ্ককার হয়ে গেল। সলীল আর জয়নাল বিদ্যুগতিতে লাফিয়ে উঠে, দাঁড়িতে ধাধা বোতলটা ঘুরিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে দুর্জনকে, ঠাস করে একটা শব্দ হল আর আমি প্রথমে নাওয়াজ খান তারপর ওসমানের চিৎকার শুনতে পেলাম। ধড়াস করে কেউ একজন পড়ে গেল, আমি সাথে সাথে প্রচণ্ড লাখি আর ঘুরির শব্দ শুনতে পেলাম। আমি বাখরম থেকে বের হয়ে এনে হাত লাগালাম, অঙ্ককারে ভাল দেখা যায় না, দূজন মনে হয় উন্মু হচ্ছে পড়ে আছে, প্রচণ্ড জোরে লাখি হাকালাম, কঁক করে শব্দ করে উঠল একজন। সলীল বলল, এখন বাইরে চল, কাজ শেষ—

জয়নাল লাধি মারতে মারতে বলল, আমি জানে বেরে ফেলব শুণের বাকাদের—

মাথা গরম কর না জয়নাল, সলীল জয়নালকে ধাক্কা দিয়ে বের করতে করতে বলল, আগে নিজের জান বাঁচাও।

আমরা ছুটি বাইরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ছিটকিনিটা ঢেনে দিলাম। হঠাৎ মনে হল, আর পায়ে জোর নেই, হাতু ভেঙে বসে পড়লাম তিনজন। বড় বড় নিখন্দ্রস নিতে থাকি, মনে হয় বুক একেবারে ফাঁকা হয়ে আছে বাতাদের জন্যে। কি ভয়ঙ্কর বিপদের হাত থেকেই না বেঁচে এসেছি!

ঘরের ভিতর থেকে নাওয়াজ খানের গলা শুনতে পেলাম। কেমন যেন ভাঙা গলায় বললেন, ওসমান! কি হল এটা ওসমান? কি হল?

ওসমান কোন কথা বলল না, কেমন যেন গোঙানোর মত শব্দ করল। ভিতর থেকে তারা দরজায় ধাক্কাধাকি করতে থাকে, শক্ত ভারি দরজা, কিছু করতে পারবে মনে হয় না।

আমি ফিসফিস করে বনলাম, চল পালাই।

জয়নাল বলল, যদি পালিয়ে যায়?

নাওয়াজ খান ভিতর থেকে বলল, এই যে হেলেরা তোমরা দরজাটা খুলে দাও, পীজ ! যদি খুলে দাও তাহলে—

তাহলে কি?

তোমাদের এত টাকা দেব যে তোমরা—

জয়নাল হিসহিস করে বলল, তোর টাকায় আমি পিশাব করে দিই।

আমি জয়নাল আর সলীলকে ঢেনে কোন ঘাতে নিচে নামিয়ে আনি। পিছনে নাওয়াজ খান তখনে আমাদের ডাকাডাকি করে যাচ্ছে।

বাইরে তখনে বৃষ্টি পড়ছে টিপটিপ করে। আমরা চূপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। পুলিশকে বলতে হবে কিন্তু ঠিক কিভাবে বলব বৃষ্টি পারছি না। পুলিশ কি আমাদের কথা শুনবে? শুনলেও কি বিশ্বাস করবে?

ঠিক তখন দেখি ছাতা ঘাঁথায় লম্বা লম্বা পা ফেলে একজন আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। মানুষটি কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল। হাতে একটা টর্চলাইট, সেটা আমাদের পারের কাছে ঝালিয়ে বলল, কে? মুনীর? সলীল?

আমরা আনলে চিৎকার করে উঠলাম, ভারুল স্যার! ভারুল স্যার!

ভাল আছ তো তোমরা?

জি স্যার! ভাল আছি। চিঠি পেয়েছেন আমাদের?

হ্যা, চিঠি পেয়েই তো আসছি। চিঠিতে লিখেছ—

ধরে ফেলেছি স্যার।

ধরে ফেলছে? ভারুল চৌধুরী অবাক হয়ে বললেন, কি ধরে ফেলেছ?

নাওয়াজ খান আর ওসমানকে। জয়নালকে বেধে মেখেছিল, ছুটিয়ে এনেছি!

সলীলকেও ধরে ফেলেছিল—

কি বলছ তোমরা?

খোদার কাস্য! আমি হত্তবড় করে কথা বলতে থাকি, সলীল আমাকে ধানিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করে, জয়নাল তার মাকে হংকার দিয়ে বলে, ভবাই করে ফেলব বদমাইছের বাকাদের। ভবাই করে ফেলব।

ভারুল চৌধুরী কি হয়েছে বোকার চেষ্টা করতে থাকেন। আমাদের চেম্বেচিতে দেখতে দেখতে আমাদের ধিরে একটা ভিড় জমে উঠে। অন্য সময় হলে কেউ আমাদের কথা শুনত কিনা জানি না, কিন্তু এখন সবাই শুনছে। ভারুল চৌধুরী শুধ মন দিয়ে শুনছেন, সে জন্যেই হয়তো।

বুকটা হঠাৎ হালকা হয়ে যায়, আর আমাদের কোন ক্ষয় নেই। জানে বেঁচে গেছি আমরা।

আহ! বেঁচে থাকা কি আনন্দের ব্যাপার!

১৪. পুলিশ

দশটা খুব অস্মত। নাওয়াজ খানের হাতে হাতকড়া লাগানো। হাতকড়া লাগানোর সময় হাতগুলি পিছনে কেন রাখা হয় কে জানে? তাকে একটা চেরারে বসানো হয়েছে, হাজার হলেও একজন সন্মানী ভাঙ্গার মানুষ।

ওসমানের হাতেও হাতকড়া, কিন্তু তার জন্যে কোন চেরার নেই, সে বসেছে দেখেতে। দুজনের মূখ খুব গভীর, দেখে মনে হয় গভীর ঘনোয়েগ দিয়ে কিছু আবছে। নাওয়াজ খানের কপালটা খুলে আছে, জয়নালের বোতল দিয়ে লেগেছে। ওসমানের বাম চোখটাও প্রায় ঝুঁজে এসেছে। অক্ষণারের সেই মারামারিতে কে কোথায় মার খেয়েছে বোধ মুশকিল।

বড় একটা টেবিলের এক পাশে বসেছেন একজন পুলিশ অফিসার। মাঝবয়সী মানুষ, মুখে মোটা মোটা খোক। দেখে কেহন যেন ভয় করে। টেবিলের অন্য পাশে বসেছেন জাফর চৌধুরী। তার মুখটাও খুব গভীর। কারণটা কি কে জানে। জাফর চৌধুরীর অনাপাশে তিনটি চেয়ারে বসেছেন আমার বাবা, সন্মীলের বাবা আর উকিল সাহেব। পুলিশ অফিসার গভীর রাতে কনেস্টেবল পাঠিয়ে এই তিনজনকে ডেকে পাঠিয়েছেন। টেবিলের সামনে একটা বেঁকে আমি, সন্মীল আর জয়নাল চাপাচাপি করে বসেছি। আমাদের চারপাশে অনেক কয়জন পুলিশ, সবাই ইটার্হাটি করছে, ব্যস্ততা নেই, কিন্তু ইটার্হাটির মাঝে খুব একটা গুরুত্বের ভাব।

পুলিশ অফিসারটি টেবিলে একটা পেনিল ঝুকতে ঝুকতে বললেন, আমি অনেকদিন থেকে পুলিশে ঢাকির করি কিন্তু এরকম কেস একটা ও দেখিনি।

জাফর চৌধুরী বললেন, ওনে ভরসা পেলাম। এরকম কেস যে একটা ও আছে সেটাই কি বেশি নয়?

তা ঠিক প্রচেসর সাহেব। পুলিশ অফিসার মাঝে নাড়লেন, যদি এই ছেলেরা না ধরত, কোনদিন কি আমরা ধরতে পারতাম? পারতাম না। কোনদিনই পারতাম না।

জাফর চৌধুরী বললেন, আমরা যখন ছেট ছিলাম তখন মেটিমুটি হাবাগোবা ছিলাম। আর এদের দেখেন, কি বুদ্ধি! এই বয়সে এরকম বুদ্ধি চিন্তা করতে পারেন? বড় হলে কি হবে?

পুলিশ অফিসারটি হ্যাঁ করে হেসে ওঠলেন আর হঠাৎ তাকে বেশ ভাল মানুষের মত মনে হতে লাগল। এতক্ষণ তাকে দেখে যে একটু ভয় ভয় লাগছিল সেই ভায়টা কেটে গেল হঠাৎ। পুলিশ অফিসার হাসতে হাসতেই বললেন, কোথা থেকে যে এদের মাঝে এরকম বুদ্ধি বের হল! এরকম বিপদের মাঝেও মাঝে ঠাণ্ডা রেখে কি কি করেছে দেখেছেন? বাল্দের নিচে পয়সা দিয়ে ফিউজ কেটে দেওয়া, হাতের বাঁধন খুলেও ভান করা যে হাত বাঁধা, দড়ির মাঝে বোতল বেঁধে অস্ত্র তৈরি করা!

আমি আর সন্মীল কিছু না বলে নড়েচড়ে বসলাম। খুব কমই হয়েছে যে, কেউ

আমাদের প্রশংসা করেছে, প্রশংসা করলে কি বলতে হয় ছাই জানিও না। হাসি হাসি শুধ করে বসে থাকাই মনে হয় সবচেয়ে বৃক্ষিমানের কাজ।

এরকম সময় একজন মানুষ এসে পুলিশ অফিসারের সাথে নিজ গলায় বেশ অনেকক্ষণ কথা বলল। কি নিয়ে কথা হজ্জিল ঠিক বুঝতে পারলাম না। পুলিশ অফিসারটি গভীর হয়ে মাঝে নাড়তে লাগলেন। তারপর কি একটা বললেন, তখন আরও কয়েকজন পুলিশ এসে নাওয়াজ খান ও ওসমানকে সরিয়ে নিয়ে গেল। পুলিশ অফিসার একটা লম্বা নিশ্চান্ত ফেলে বললেন, কি সাংঘাতিক ব্যাপার! মানুষ বেরক্ষম করে সুপারির কিংবা গুড়ের ব্যবসা করে এবা সেভাবে ছেট ছোট গরিব বাক্সাদের কিডনি, লিভার এসবের ব্যবসা করত। চিঞ্চা করতে পারেন?

উপস্থিত যাবা ছিল সবাই আবার অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাঝে নাড়ল। ঠিক এসবয় একজন মানুষ বেশ অনেক কাপ চা আর বিস্কুট নিয়ে এল। এখন গভীর রাত, বেশি রাত হলে আমি কিছু খেতে পারি না, কিন্তু আজকে বিস্কুটগুলি দেখে হঠাৎ আমার খিদে চাগিয়ে উঠল। পুলিশ অফিসার বিস্কুটগুলি আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে চায়ে চুক্ক দিলেন। তারপর সন্মীলের ব্যবসা দিকে তাকিয়ে বললেন, সন্মীল আপনার হেলে?

সন্মীলের ব্যবসা মাঝে মাঝে নাড়লেন। পুলিশ অফিসার তখন ব্যবসা দিকে তাকিয়ে বললেন, আর মুনীর আপনারাই?

ব্যবসা মাঝে নাড়লেন।

কেমন করে এরকম বৃক্ষিমান হেলে হয় আপনাদের? এইচুকু হেলে, কি বুদ্ধি! কি রকম বিপদে মাঝে ঠাণ্ডা রেখেছে! শুধু কি বুদ্ধি? আরেকজনকে বাঁচানোর জন্যে কত বড় বুদ্ধি দিয়েছিল চিঞ্চা করতে পারেন? কি রকম চমৎকার ব্যাপার! তাই না রে জয়নাল?

জয়নাল ভোরে ভোরে মাঝে নাড়ল।

পুলিশ অফিসার মাঝে নাড়তে নাড়তে বললেন, আমাকে বলতেই হবে আপনাদের হীরার টুকরা হেলে। একটু ডানপিটে হয়তো কিন্তু একেবারে সোনার খনি—

সন্মীলের ব্যবসা একটু নড়েচড়ে বললেন, আপনার কথা শুনে ভাল লাগল স্যার। বড় ভাল লাগল। টানাটানির সংসার, ছেলেমেয়েদের যত্ন করতে পারি না। এই ছেলেটা তো বলতে গেলে নিজে নিজেই বড় হচ্ছে। আশীর্বাদ করেন যেন মানুষ হয়।

অবিশ্যি অবিশ্যি আশীর্বাদ করব। একশব্দের আশীর্বাদ করব।

পুলিশ অফিসার তখন ব্যবসা দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার কেমন লাগে যখন দেখেন আপনার ছেলে এরকম সাংঘাতিক একটা কাজ করেছে?

ব্যবসা কিছু বললেন না, নড়েচড়ে বসলেন।

পুলিশ অফিসার হেসে বললেন, আপনার হয়তো বেশি আশ্চর্য মনে হয় না। সব সময়েই দেখে এসেছেন হীরার টুকরা হেলে! আমি বাঁজি ধরে বলতে পারি, তবুও গর্বে বুক খুলে থাক। যাই না?

বাবার মুখ কেমন জানি ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সেই অবস্থায় খুব কষ্ট করে খুব দুর্বলভাবে একবার মাথা নাড়লেন।

পুলিশ অফিসার তখন আমাদের দিকে তাকালেন, তারপর চোখ নাচিয়ে বললেন, আমার ডিপার্টমেন্টে আসলে তোমাদের মত কর্মজন মানুষ দরকার! খাটি ডিটেকটিভ—

জারুল চৌধুরী হাত নেড়ে বললেন, সর্বনাশ! কি করছেন আপনি! ভানপিটে ছেলে এরা, সত্তি সত্তি চোর-ভকাত-খুনদের সাথে হাতাহাতি শুরু করে দেবে। ভাল চান তো ওদের আচ্ছামত বকে দিন। আর হেন এরকম না করে।

পুলিশ অফিসার আমাদের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, প্রফেশ্বর সাহেব ঠিকই বলেছেন। তোমাদের বেশি উৎসাহ দেবিয়ে কাজ নেই—

হঠাতে কি মনে হল জানি না, আমি বলে ফেললাম, আমি আসলে আরো একটা কাজ করছি।

সবাই আমার দিকে ঘূরে তাকাল। পুলিশ অফিসার ঘূরে তাকিয়ে বললেন, কি কাজ?

এখানে ভেজাল ওয়ুধের ব্যবসা হচ্ছে সেটা বের করার চেষ্টা করছি।

আমি আড়চোখে বাবার দিকে তাকালাম, তাঁর চোয়াল হঠাতে ঝুলে পড়ল, মুখ মাছের মত নম্বুক লাগল। পুলিশ অফিসারটি একটু ঝুকে পড়ে বললেন, ভেজাল ওয়ুধ?

ঝী।

কে ভেজাল ওয়ুধের ব্যবসা করে?

আমি একটু ইতিঃপুত্র করে বললাম, সেটা বলার এখনো সময় হয়নি।

পুলিশ অফিসার হাসিমুখে বললেন, ইনভেন্টরিগোশান বাকি আছে এখনো?

আমি মাথা নাড়লাম।

বেশ! যখন ইনভেন্টরিগোশান শেষ হবে, আমাকে বল।

আমি মাথা নাড়লাম, বলব।

জারুল চৌধুরী আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, চোখে চোখ পড়তেই তিনি একবার চোখ ঢটিকালেন, ঘার অর্ধ বাইরের কেউ বুঝতে পারল না। সলীল কনুই দিয়ে আমার পেটে একটা খোঁচা দিয়ে গলা নথিয়ে বলল, তুই একটা ডেঙ্গুরাস মানুষ!

আমি বাবার দিকে তাকালাম। তাঁর সমস্ত মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে আছে। এর আগে আমি তাঁকে কখনো ভয় পেতে দেবিনি। আগে লক্ষ্য করেছিলাম, রাগ হলে বাবার চেহারা খুব খারাপ হয়ে যায়। এখন দেখছি ভয় পেলেও তাঁর চেহারা খুব খারাপ হয়ে যায়।

১৫. শেষ কথা

বাবা আমাকে আর লাবলুকে আর কখনো মারেননি। তার মানে এই নয় যে, বাবা একেবারে মহৎপ্রাণ মানুষ হয়ে গেছেন, হঠাতে করে আমাদের জন্যে ভালবাসায় তার বুক উঠলে উঠলে উঠেছে। সেরকম কিছু হয়নি, বাবা আগের মতই আছেন। খারাপ মানুষেরা, নিষ্ঠুর হন্দয়াইন মানুষেরা হঠাতে করে খুব ভাল হয়ে গেছে এগুলি শুধু গল্প আর উপন্যাসে পাওয়া যায়। সত্ত্বকারের জীবনে মনে হয় সেটা হয় না। যে খারাপ সে খারাপই থাকে, শুধু তার সাথে কেন্দ্রভাবে বেঁচে থাকা শিখতে হয়। আমরা সেটা শিখছি। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, এখনো আমাদের যাবার জন্যে বাবার হাত নিশ্চিপ্প করে কিন্তু আর সাহস করতে পারেন না। যদি তাঁর ভেজাল ওয়ুধের কথা বলে দেই।

এমনিতেই আমাদের ছেটি শহুরটাতে আমার আর সলীলের বেশ নামধার হয়েছে। খবরের কাগজে আমাদের ছবিও ছাপা হয়েছিল। আমি আর সলীল দাঢ়িয়ে আছি মাঝখানে একটা টুলে, জয়নাল বসে আছে। ছবি জেলার সবচেয়ে ফটোগ্রাফার বলেছিল হাসি হাসি মুখ করে তাকাতে, জয়নাল একেবারে সবগুলি দাত বের করে দেসে ফেলল। খবরের কাগজের সেই অংশটা আমি কেটে রেখেছি, বাসায় কেড়ে এলে সুযোগ পাওয়া মাত্রাই তাদের দেখাই।

নাওয়াজ খান আর ওসমানের বিচার শুরু হয়েছে। দুজনেই নাকি ঘাঘু মানুষ। আগের অনেক ইতিহাস আছে, জামিন পার্যনি বলে জেলেই আছে। সবাই বলছে যাসি হয়ে থাবে দুজনেরই।

জারুল চৌধুরীর সাথে এখনো যোগাযোগ আছে। আমাদের হেডস্যাকে নিয়ে ফিল্ড ট্রাপে একবার তাঁর বাসার গিরেছিলাম। নদী, জংগল, গাছপালা, গাছের উপর গাছের, দেখে সবাই একেবারে মুণ্ড হয়ে গিরেছিল। জারুল চৌধুরী একটা লোকা কিনেছেন, পিছনে ইঞ্জিন লাগিয়ে নাকি লোকা ভয়ে বের হবেন। সাথে থাকবে দুই দিশু কাগজ। সেই কাগজে তিনি তাঁর বহুজ লিখবেন — “শিশুদের ক্যালকুলাস”।

নাওয়াজ খানের পুরো ব্যাপারটা যেভাবে শেষ হয়েছে সেটাতে সবচেয়ে বেশি শুধু হয়েছে লাবলু। বাবার মার খেতে হয় না বলে আজকাল সে অনেক হাসিখুশি থাকে। প্রতি রাতেই দুমানোর আগে বলে, সে ভাইয়া, তোমরা কেবল করে নাওয়াজ খানকে ধরেছ গল্পটা বলবে?

আমি বলি, শুধু, গাধা! এক গল্প মানুষ কয়বার শুনে?

লাগলু বলে, বল না আরেকবার — যাত্র একবার।

আবি তখন তাকে গল্পটা আবার বলি। প্রত্যেকবারই গল্পটির সাথে আরো
অনেক অনেক মালমশলা ঘোগ করি। অনেকখানি অতিবঞ্চন, নানারকম ইস্যু-
কোরুক, ঝট্টি-তামাশা।

শুনে লাবলু একেবারে হেসে কৃটিকৃটি হয়।

কতদিন এভাবে চলবে জানি না। কিন্তু যতদিন চলছে ততদিন তো উপভোগ করে
নিই। এই ছেটি শহরে তো আর দৈনন্দিন এরকম বড় ঘটনা ঘটে না।